আগামীদিনের মুক্তমনা

আকাশ মালিক

মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য হলো, মানুষ জন্ম থেকে প্রশ্ন করা, জানা, খোঁজা, কথা বলা ও চিন্তাবিলাসী। পশু তা পারে না, পশুর মধ্যে এ সমস্ত গুণ নেই। সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রত্যেকটি মানব শিশু বৈজ্ঞানিক হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে জন্ম নেয়। শিশু তার চারপাশের ঘটনাবলি থেকে জ্ঞান অর্জন করে। বিজ্ঞানীরূপে জন্ম নিয়েই সে তার চারপাশের জগৎকে আবিষ্কার করে। অজানাকে জানার আগ্রহ, কৌতুহল মনোবৃত্তি যেমন বড়দের, তেমন ছোটদের। শিশুরা অনবরত প্রশ্ন করে, জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে, উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে, সবকিছুতেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চায়, কারণ সে সারা জগতটাকে তার আপন দৃষ্টিকোণে আবিস্কার করতে চায়।

সে আপনার কাছে হয়তো জানতে চাইবে সূর্যের তাপমাত্রা কত, কফির উপরে ক্রীম কেন ভাসে, দুধ কেন ভাসে না, ছোট লোহার টুকরা কেন জলে ডুবে আবার এতবড় জাহাজ ভাসে কিভাবে, কিংবা হয়তো প্রশ্ন করবে, আগুন জল দিলে নেভে আবার কেরোসিন দিলে বাড়ে কেন, অথবা রঙধনুর সাত রঙ কেন, কেন রঙধনু হয়, কিভাবে হয়, কোথা থেকে হয়? হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর আপনার জানা নেই। কিন্তু এমন কোন উত্তর তাকে দেবেন না যার কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ নেই। আমাদের মনে রাখা উচিৎ, আজকের শিশুরা জন্ম নিয়েছে বিজ্ঞানের অপরিসীম সাফল্যের যুগে। যে মানুষ এক সময় পৃথিবীর আগুন ব্যবহার করতে জানতো না, সে মানুষ আজ সূর্যের আগুন নিয়ে খেলতে জানে, সূর্যের তাপ ব্যবহার করে গাড়ি চালায়। বই পড়ে মানুষ আগুন আবিস্কার করে নাই, জাহাজ পানিতে কেন ভাসে আর্কিমেডিস কোন স্কুলের শিক্ষকের কাছ থেকে শেখেন নাই। জগতের এত আবিস্কার, বিজ্ঞানের এত বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে যে সকল মহামানবদের অবদান, তাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন অতিসাধারণ পরিবারের সাধারণ মানুষ।

শিশুর অনুসন্ধিৎসু মনের একটি উদাহরণ দেই। মা দেখলেন একটি মাত্র ডিম ঘরে আছে যা আজকের নাস্তার টেবিলে স্বামীকে দেবেন। হঠাৎ করেই পাঁচ বৎসরের ছেলেটি ফ্রিজ থেকে ডিমটি বের করে মাটিতে ছুঁড়ে ভেঙে ফেললো। এমতাবস্থায় মা তেলে বেগুনে আগুন না হয়ে, বাবা অগ্নি চক্ষু না করে তাকে প্রশ্ন করলেন, সে কী ভেবে ডিমটি ভাঙলো। ছেলেটি উত্তর দিলো, বড় ভাইয়ের ছোট বলটি মাটিতে ছুঁড়লে কি সুন্দর লাফ দেয়, দৌঁড়ে, ডিমটা কেন তা করল না? এর পরে তার আরো কিছু জানার আছে। বলটির ভেতরে বাতাস না থাকলে বলটি লাফ দেয় না কেন? আবার কোন জিনিস শক্ত জায়গায় যত সহজে ভাঙে নরম জায়গায় তত সহজে ভাঙে না কেন? একটি ডিম ভাঙাকে কেন্দ্র করে যে সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন তার উত্তর পেতে হলে আপনাকে জানতে হবে বস্তুর ধর্ম, গতি, শক্তি, বাতাসের ওজন, ঘনত্ব এসব কিছু।

শিশুর অনুসন্ধিৎসু মন জানতে চায়, খুঁজতে চায় ঘটনার পেছনের ঘটনা। আপনি এখান থেকেই শুরু করতে পারেন আপনার ছেলের ইউনিভার্সিটির প্রথম ক্লাস। আপনি বলতে পারেন, আমার তো বাবা এতসব উত্তর জানা নেই, চলো আমরা দু-জন মিলে এর উত্তর খুঁজি, কিংবা বলতে পারেন, তুমি নিয়মিত স্কুলে যাবে, স্কুলে সব উত্তর পাওয়া যায়। অথবা বলতে পারেন, চলো লাইব্রেরিতে যাই, অজানাকে জানার একটা বই নিয়ে আসি। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নাগরিকের ভাল হওয়া, মন্দ হওয়া, শিক্ষিত হওয়া, মূর্খ হওয়া, পরোপকারী হওয়া, অনিষ্ঠকারী হওয়া, চরিত্রবান হওয়া, চরিত্রহীন হওয়া নির্ভর করে প্রথমত মা বাবা, দ্বিতীয়ত চার-পাশের পরিবেশের ওপর। সব শিশুর মনেই নজরুল হওয়ার বাসনা আছে। সব শিশুই বলতে চায় 'বিশ্ব জগত দেখবো আমি আপন হাতের মুঠোয় পরে'। চৈতন্যতা, গতিশীলতা, মনন, ভাবনা-শক্তি মানুষের জন্মগত গুণ, আর এই গুণ মানুষকে দিয়েছে অপরিমেয় সুপ্ত ক্ষমতার অধিকার, যা অন্য জীবের মধ্যে নেই। সংবিৎ এবং চৈতন্যতার গুণে মানুষ হয়েছে অনন্য। দূরকল্পী ভাবনা (স্পেক্যুলেটিভ থিংকিং) একমাত্র মানুষই করতে পারে। আর এই দূরকল্পী ভাবনাকেই বলা হয় দর্শন। দার্শনিকতার জোরেই পৃথিবীর মানুষ মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিজ্ঞান ও দর্শনে যে জাতি যত বেশি উন্নত, নিঃসন্দেহে সেই জাতিই পৃথিবীতে তত বেশি উন্নত, সুখী এবং শক্তিশালী

মানুষের বেঁচে থাকার পথ খোঁজা শুরু হয় মায়ের গর্ভ থেকে। ভ্রূণ মনুষ্যাবয়ব পাওয়া থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজা শুরু করে। এক সময় মা তার এই খোঁজা-খুঁজি টের পান। মা বোঝেন তার পেটের সন্তান বেরিয়ে আসার অর্গলটি পেতে দেয়াল হাতড়ে বেড়াচ্ছে। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে ঠিক সময়মত একদিন বেরিয়ে আসার দ্বার সে খুঁজে পায়। ধরিত্রীর সদস্যের খাতায় নাম লেখানোর পর থেকে তার খোঁজা-খুঁজি শুরু হয়, মৃত্যুর আগপর্যন্ত তা চলতে থাকে। জগতের অপরিসীম অগণিত, অসীম বিস্ময়কর সৃষ্টিতত্ত্ব যদি অজানা, অনাবিস্কার থেকে যায়, মানুষ যদি তা জানতে না পারে, যদি

জানার সুযোগ দেয়া না হয়, মানব জনমটাই তার ব্যর্থ হয়ে যাবে। যে সুযোগ, যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত, বিতাড়িত, নিন্দিত, আহত, নিহত হয়েছেন কালের অনেক ইমাম, মোজাদ্দিদ, সুফি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিকগণ। তাদের মধ্যে আবু-মুসা বিন মনসুর হাল্লাজ, ইবনে রুশদ, ইবনে সিনা, আল গাজ্জালী, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়া, আলবার্ট আইনস্টাইন, গ্যালিলিও, আইজ্যাক নিউটন, সক্রেটিস, স্টিফেন হকিন্স অন্যতম। এ ধরায় যুগে যুগে সৃষ্টিশীল, মননশীল, বিদূষী, মনীষীর জন্ম হবে, যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে খোঁজার, বলার, জানার, বোঝার, অনুসন্ধান করার, প্রশ্ন করার সুযোগ দিই।

নারীবাদ ও নারীবাদী

(উৎসর্গ : বাংলাদেশের প্রথম নারীবাদী রোকেয়াকে)

নন্দিনী হোসেন

লেখার শুরুতেই নারীবাদের সহজ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি। আমাদের অনেকেরই মনে 'নারীবাদ' ও 'নারীবাদী'দের নিয়ে প্রচুর ভ্রান্ত ধারণা আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যেও 'নারীবাদ' শব্দটি নিয়ে বেশ নেতিবাচক ধারণা যে করেই হোক জন্ম নিয়েছে। তাছাড়া শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটা বৃহৎ অংশের ভিতরও এই নিয়ে এক ধরনের ধোঁয়াশা বিদ্যমান।

আসলে 'নারীবাদ' বিষয়টি কী? এ প্রশ্নের যথাযথ, সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর পেতে আমরা উইকিপিডিয়ার সাহায্য নিতে পারে। সেখানে নারীবাদ অথবা Feminism এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

Feminism is a diverse collection of social theories, political movements and moral philosophies, largely motivated by or concerned with the experiences of women. Most feminists are especially concerned with social, political and economic inequality between men and women (in the context of it being to the disadvantage of women); some have argued that gendered and sexed identities, such as `man' and `woman', are socially constructed. Feminists differ over the sources of inequality, how to attain equality, and the extent to which gender and gender-based identities should be questioned and critiqued. In simple terms, feminism is the belief in social, political and economic equality of the sexes, and the movement organised around the belief that gender should not be the pre-determinant factor shaping a person's social identity, or socio-political or economic rights.

উপরের সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারি 'নারীবাদ' আসলে এমন কিছু নয় যা নিয়ে নানামুখি ভুল ধারণা আমাদের অনেকের মধ্যে গেড়ে আছে। যেমন কারো কারো ধারণা যিনি 'নারীবাদি' চিন্তা চেতনা নিজের ভিতর লালন করেন, তিনি উচ্ছন্নে-যাওয়া কেউ! তিনি সমাজ সংসারের ধার ধারেন না! পুরুষের উপর নারীর আধিপত্য বিস্তার করতে চান বা পুরুষবিদ্বেষী হন, অথবা পুরুষদের প্রতিপক্ষ ঘোষণা করে সারাক্ষণ যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে থাকেন। যদিও ব্যক্তিগতভাবে কেউ তা হতে পারেন কিন্তু, নারীবাদের সংজ্ঞা থেকে আমরা যে বিষয়টা বুঝি তা হচ্ছে, নারীবাদীরা পুরুষের পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগসুবিধা আদায়ের জন্য লড়াই বা আন্দোলন যাই বলি না কেন তা নিয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। প্রবলভাবে পুরুষশাসিত সমাজ সৃষ্ট লিঙ্গ বৈষম্য উপড়ে ফেলে কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেন। যত দিন পর্যন্ত এই সমতা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিকভাবে নিশ্চিত না হচ্ছে তত দিন নারীবাদীদের দাবি আদায়ের জন্য এই আন্দোলন চলতেই থাকবে। এটা শুধু নারীবাদের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজের সর্বস্তরের তুলনামূলকভাবে কম সুবিধাপ্রাপ্তরা নিজেদের বঞ্চিত বোধ করেন স্বাভাবিক কারণেই। যার জন্য নিজেদের দাবি আদায়ের পথে বাধাবিপত্তি ডিঙানোর জন্য তাদের দৃঢ় ও শক্তিশালী অবস্থান নিতে হয়।

'নারীবাদের' ইতিহাসের দিকে আমরা যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাবো 'নারীবাদ' আসলে হঠাৎ করে উড়ে এসে জুড়ে বসা কিছু নয়, যেমনটা আমরা অনেকেই ধরে নেই। অধিকার আদায়ের জন্য ধাপে ধাপে এগুতে হয়েছে নারীবাদীদের। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় আঠারোশো শতকেরও আগে নারীবাদের অস্তিত্ব ছিল যদিও তার ডালপালা বিস্তার করে ওই শতকেরই শেষ ঘটাতে গেলে যে শক্তি, যে দৃঢ়তা, পরিবারে যে অবস্থানের প্রয়োজন হয় তা থেকে তাকে কৌশলে বঞ্চিত করা হয়েছে যুগ যুগ ধরে। তিনি এই বৈষম্যকে মানেন নিয়তি বলে। নারীর নিয়তি! সেই নিয়তি মানেননি বেগম রোকেয়া। মানেননি বলেই আজকের রোকেয়াকে আমরা পেয়েছি বাঙালি মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে। তাঁর কোনো কোনো সমালোচক বলেন তিনি পুরুষতন্ত্রের সাথে আপোস করে টিকে ছিলেন। তবে হুমায়ূন আজাদ যথার্থই বলেছেন, রোকেয়া তখন কিছুটা আপোষ করেছিলেন বাধ্য হয়ে সত্যি–কিন্তু, 'তিনি পুরুষতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্যে নিরন্তর লড়াই করে গেছেন; তাঁর রচনাবলি পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ধারাবাহিক মহাযুদ্ধ।' তিনি রোকেয়ার আপোসকামিতা নিয়ে আরও যে প্রণিধানযোগ্য কথাটি উল্লেখ করেছেন তা হলো, 'রোকেয়া পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে চালিয়েছিলেন সার্বিক আক্রমণ। তিনি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছেন পুরুষতন্ত্রের তৈরি নারী ও পুরুষের ভাবমূর্তি, বর্জন

করেছেন নারীপুরুষের প্রথাগত ভূমিকা; তুলনাহীনভাবে আক্রমণ করেছেন পুরুষতন্ত্রের বলপ্রয়োগ সংস্থা ধর্মকে । রোকেয়া পরে ধর্মের সাথে কিছুটা সন্ধি করেছেন আত্মরক্ষার জন্য; নইলে তাঁকে ও তাঁর আদর্শকে অত্যন্ত বিপন্ন করে তুলতো মুসলমান পিতৃতন্ত্র ।' রোকেয়া যখন নির্দ্বিধায় বলেন 'আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ।' তখন এ থেকেই বোঝা যায় নারীর সামগ্রিক অধিকার প্রতিষ্টা করতে চাইলে ধর্মকে পাশ কাটিয়ে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' জাতীয় আন্দোলন করে ফল পাওয়ার আশা করা হবে চরম বোকামি ।

তথ্যসূত্র : www.wikipedia.com
'নারী' : হুমায়ুন আজাদ
A Vindication of the rights of woman : Wollstonecraft

প্রবন্ধ

মোহনীয় মোনালিসা

ফরিদ আহমদ

পৃথিবীর তাবৎ রমণীকূলের মধ্যে মোনালিসার মতো এতো প্রচার, প্রচারণা এবং ভালবাসা বোধহয় আর কেউ পায়নি। জনপ্রিয়তার দিক থেকে ভিঞ্চির এই মানস সুন্দরী ম্লান করে দিয়েছে অনেক বাঘা বাঘা হলিউড সুন্দরীদেরকে। যৌবনের কোনো না কোনো সময় মোনালিসার প্রেমে পড়েনি এমন পুরুষ খুঁজে পাওয়া রীতিমত বিরল। মোনালিসার কৌতুকপ্রিয় চোখ আর ঠোঁটের কোণে ঝুলে থাকা এক টুকরো রহস্যময় হাসি অনেক যুবকের রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। শত শত বছর ধরে মোনালিসার হাসির রহস্য উদঘাটনে ব্রতী হয়েছে অসংখ্য কবি, শিল্পী এবং সাহিত্যিকেরা। তা সত্ত্বেও রহস্যময়ী মোনালিসার রহস্যময় হাসি রয়ে গেছে রহস্যের অন্তরালে। যুগে যুগে বিপুল সংখ্যক গবেষণা, সাহিত্য, কাব্য আর সঙ্গীত রচিত হয়েছে মোনালিসাকে ঘিরে। প্রেমিকেরা তাদের প্রেয়সীর মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছেন মোনালিসার অপার রহস্য, চোখের গভীরে পেতে চেয়েছে মোনালিসার অনন্য ঝিকিমিকি কৌতুক। সে কারণেই বোধহয় সব যুগেই পুরুষেরা তাদের স্বপ্নচারিণীদের তুলনা করে এসেছে মোনালিসার সাথে। মোনালিসা হয়ে উঠেছে সৌন্দর্য আর রহস্যময়তার প্রতীক হিসাবে।

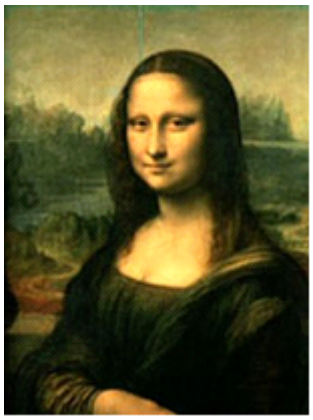

চিত্র : লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসা

কী আছে পাঁচশো বছর আগে ইতালীয় রেঁনেসার শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসার মধ্যে যে, যার কারণে তাকে নিয়ে এতো উন্মাদনা, এতো আগ্রহ, এতো ভালবাসা, এতো প্রচার? এ রহস্যেরও সমাধান কেউ দিতে পারেনি এখন পর্যন্ত। শত শত পণ্ডিত, গবেষক এবং ঐতিহাসিকেরা পৃথিবীর দূর দূরান্তের লাইব্রেরীতে গিয়ে পুরোনো দলিলপত্রে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন মোনালিসার রহস্য উদ্ধার করার জন্য।

রহস্য ও গোপনীয়তায় আচ্ছন্ন এই প্রতিকৃতিটি আঁকা হয়েছে ৭৭×৫৩ সেন্টিমিটার বৃহৎ পপলার প্যানেলে। এতে কোনো স্বাক্ষর ছিল না এবং কোন তারিখও দেয়া নেই। লিওনার্দোর অন্য সব ছবির ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে সেগুলোর স্কেচ বা ছবিটি সম্পর্কে কিছু বর্ণনা লিওনার্দো তার নোটবুকে লিখে রেখেছেন। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার হাজার হাজার পৃষ্ঠার নোটবুকে মোনালিসা সম্পর্কে একটি লাইন বা কোন স্কেচ পাওয়া যায় নি। ঐতিহাসিকেরা মোটামুটি একমত যে, লিওনার্দো তার শেষ বয়সে মোনালিসা এঁকেছেন তবে ঠিক কত সালে মোনালিসা আঁকা হয়, সে বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে ১৫০৬ সালে মিলানে ফিরে আসার আগে ফ্লোরেনসে আঁকা হয়েছে। আবার অন্যেরা

দাবি করেন যে ছবিটি হয়তো ফ্লোরেনসে আঁকা শুরু হয়েছে কিন্তু শেষ হয়েছে কয়েক বছর পর মিলানে। শুধু কোন সময়ে আঁকা হয়েছে তাই নয়, ঐতিহাসিকেরা এটা জানারও চেষ্টা করেছেন যে, কেন লিওনার্দো এই প্রতিকৃতিটি আঁকতে গেলেন? কেউ কি তাকে এটা করে দিতে বলেছিল? যদি তাই হয়, তবে কে সে? লিওনার্দো তার অন্য সব চিত্রকর্মই বায়নাকারীদের দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু মোনালিসার ক্ষেত্রেই তার একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছে। তিনি এটাকে তার সাথেই রেখে দিয়েছিলেন দীর্ঘদিন। কেন এটা বায়নাকারীকে কখনোই দেওয়া হয়নি? এই সমস্ত প্রশ্নের কোন সদুত্তর এখনো পাওয়া যায়নি।

চিত্র : লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

আদিতে এই ছবিটি এখনকার তুলনায় আকৃতিতে বেশ খানিকটা বড় ছিল। ছবিটির দুই পাশের দুটো কলাম বা পিলার কেটে ফেলা হয়েছে। একারণেই এখন ছবি দেখে সহজেই বোঝা যায় না যে মোনালিসা আসলে টেরাসে বসে ছিল।

আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং মোনালিসার কিছু কিছু অংশ পরবর্তী সময়ে রঙ করার কারণে বর্তমানে ছবিটির অনেক আনুঙ্গিক বিষয়ই দৃশ্যমান নয়। তা সত্ত্বেও ছবিটির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ঠিকই অক্ষুণ্ন রয়েছে।

মোনালিসা সেই সময়ের জন্য ছিল অনন্যসাধারণ। যারা মোনালিসা দেখেছেন তাদের কাছে মনে হবে যেন কোন প্রতিকৃতি নয়, পুরোপুরি জীবন্ত এই মহিলা। ঠোঁটের কোণে রহস্যময় এক চিলতে হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে দর্শকের দিকে। ক্ষণে ক্ষণে আবার এই হাসির রূপও বদলে যায়। কখনো এই হাসিকে মনে হয় নিষ্পাপ, বড় পবিত্র আবার কখনোবা মনে হয় বিদ্রুপ করছে আশেপাশের সবাইকে। আবার কখনোবা মনে হয় কোন হাসিই নেই তার ঠোঁটে। জীবন্ত কাউকে যে পুরে রাখা হয়েছে ক্যানভাসে; এক্ষুনি হয়তো বের হয়ে আসবে ক্যানভাস ছেড়ে। আর দশটা জীবন্ত মানুষের মতই মনে হয় যেন তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা রয়েছে সে কি চিন্তা করছে বা তার অনুভূতি কি তা বলা মহা দুঃসাধ্যের কাজ। সে কি আনন্দিত নাকি বিষাদগ্রস্ত, ধূর্ত নাকি সহজ সরল, শান্ত সমাহিত। নাকি পারিপার্শ্বিক সব কিছু থেকে উদাসীন কোনো নারী? যারাই মোনালিসার ছবি দেখেছেন তারা কেউই একমত হতে পারেননি। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে মোনালিসার মেজাজমর্জিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

ফুমাটো (Sfumato) কৌশল

ভিঞ্চি তার এই পোট্রেটে যে কৌশলে এই রহস্যময়তা এনেছেন তাকে বলা হয় ফুমাটো কৌশল বা পদ্ধতি। এই ইটালিয়ান শব্দটির মানে হচ্ছে ধোঁয়াশা বা ঝাপসা। তার সময়ের অন্যান্য শিল্পীরা যেখানে সুস্পষ্ট বহির্রেখা ব্যবহার করতেন সেখানে ভিঞ্চি এই ক্ষেত্রে তার বিপরীতটা করেছিলেন। মোনালিসার দেহের প্রান্তসীমাসমূহ, তার সামগ্রিক মুখমণ্ডল, হাতদ্বয় এবং কাপড়ের রয়েছে হালকা প্রান্তসীমা। এই প্রান্তসীমাসমূহ ঘিরে থাকা আলো বা ছায়ার মধ্যে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেছে। আলো এবং ছায়ার মধ্যে অদৃশ্য উত্তরণ, কখনো কখনো বিভিন্ন রং এর কোন দৃশ্যমান চিহ্ন ছাড়াই একের সাথে অন্যের মিশে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সবকিছুকেই ধোঁয়ার মতো মিশিয়ে দিয়েছেন তিনি কোন প্রান্তসীমা ছাড়াই। যে কোন প্রতিকৃতির অভিব্যক্তি মূলত নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর, মুখের এবং চোখের প্রান্ত। কিন্তু মোনালিসায় লিওনার্দো সচেতনভাবেই এই দু'টি জায়গাকেই হালকা ছায়ার সাথে অন্তলীন হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে অস্পষ্ট করে রেখেছেন। একারণে আমরা কখনোই নিশ্চিত না যে মোনালিসা কোনো মেজাজে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার অভিব্যক্তি

সবসময়ই দর্শককে বিভ্রান্তির মধ্যে রেখে দেয়। তবে শুধুমাত্র অস্পটতাই এই এফেক্ট তৈরি করেনি। এর পিছনে আরো অনেক কিছুই আছে। লিওনার্দো অত্যন্ত দুঃসাহসী একটা কাজ করেছিলেন যা শুধুমাত্র তার মত অসম্ভব প্রতিভাবানরাই করতে পারে। মোনালিসাকে খুব ভাল করে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে এর দুই পাশ পুরোপুরি মেলে না। এটা সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান পটভূমিকার স্বপ্নিল প্রাকৃতিক দৃশ্যে। বাম দিকের দিগন্ত রেখা ডানদিকের দিগন্ত রেখার তুলনায় অনেক নিচে। ফলে, আমরা যখন ছবিটির বা দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তখন মোনালিসাকে মনে হয় বেশ কিছুটা লম্বা। এ ছাড়া খেয়াল করলে দেখা যাবে যে মোনালিসার এক চোখ আরেক চোখের তুলনায় সামান্য উচুতে অবস্থিত। এই পরিবর্তনের ফলে এবং তার মুখের দুইপাশ না মেলার কারণে তার মুখচ্ছবিও পালটে যায় বিভিন্ন কৌণিক অবস্থান থেকে দেখার সময়। আলো এবং ছায়ার সচেতন ব্যবহার ছাড়াও মোনালিসার অবস্থান নিয়েও লিওনার্দো বেশ যত্নশীল ছিলেন। মোনালিসার শরীর সামান্য কাত হয়ে আছে। হাত দুটো হালকাভাবে বাহুর ওপরে রেখে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসে আছে সে। শব্দ বা কঠিন হয়ে পোজ দেওয়ার চেয়ে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তিনি চেয়েছিলেন মোনালিসাকে আঁকতে। মেরী রোজ স্টোরি (Mary Rose Storey) মোনালিসার এই ভঙ্গিমা নিয়ে লিখেছেন :

> 'লিওনার্দোর সময়ে মোনালিসার এই ভঙ্গিমা নতুন আবিস্কার হিসাবেই বিবেচনা করা হত এবং ব্যাপকভাবে অনুসৃত হত। এটা ছিল চিরায়ত ভঙ্গিমা Contrapposto-র পরিমার্জিত সংস্করণ। Contrapposto-শব্দটি ইটালিয়ান। এর মানে হচ্ছে এমন একটি ভঙ্গিমা যেখানে শরীরের এক অংশ অন্য অংশের বিপরীত দিকে বাঁকানো থাকে।'

লিওনার্দো মোনালিসা প্রতিকৃতিটি আঁকা শুরু করেন ১৫০৩ সালে। পরবর্তী চার বছর তিনি এর ওপর বার বার কাজ করেন। ১৫০৭ সালে লিওনার্দো যখন ফ্লোরেন্স ছাড়েন তখন তিনি ছবিটি তার সাথে করে নিয়ে যান। অনেকেরই ধারণা যে যেহেতু ছবিটি সম্পূর্ণ হয়নি তাই লিওনার্দো এটিকে তার সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারো কারো মতে অবশ্য, লিওনার্দো ছবিটিকে এতো ভালবাসতেন যে তিনি এর সঙ্গ ছাড়তে পারেননি।

১৫১৬ সালে ছবিটি সাথে নিয়েই লিওনার্দো ফ্রান্সে আসেন। রাজা ফ্রান্সিস I তার এ্যামবোয়েসের দুর্গের জন্য ছবিটি কিনে নেন। পরে ফাউন্টেইনব্লো, প্যারিস, ভার্সেই ঘুরে অবশেষে মোনালিসা এসে পড়ে লুডউইগ XIV এর সংগ্রহশালায়। ফরাসি বিপ্লবের পর ল্যুভের মিউজিয়ামে এর নতুন আবাস গড়ে ওঠে। মোনালিসার প্রেমে মত্ত নেপোলিয়ান সেখান থেকে একে নিয়ে যান তার শোবার ঘরে। নেপোলিয়ানের পতনের পর মোনালিসা আবার ফিরে যায় তার পুরোনো ঠিকানা ল্যুভরে।

কেউ কেউ মনে করেন যে মোনালিসা কোন একক মহিলার প্রতিকৃতি নয়, বরং অনেক মহিলার সুচতুর সমন্বয়, সমগ্র নারী জাতির প্রতীক। অন্যদের মতে এটা ড্রাগের প্রভাবযুক্ত ভিঞ্চির কোন পুরুষ মডেলের ছবি। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, মোনালিসা কোনো প্রতিকৃতিই নয়, বরং ভিঞ্চির অসাধারণ কল্পনার রূপমাত্র। কেউ কেউ আবার একে ভিঞ্চির মায়ের প্রতিকৃতি বলেও রায় দিয়েছেন।

লিওনার্দো বক্রতলে আলোর কারুকাজ নিয়ে অতি উৎসাহী ছিলেন। রেশমি আচ্ছাদন, মোনালিসার চুল, তার ত্বকের উজ্জ্বলতা, সবকিছু তৈরি হয়েছে স্বচ্ছ রঙ এর অতি পাতলা আস্তরণ দিয়ে। এর ফলে মনে হয় মোনালিসার মুখে ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল আভা, ছবিটি পরিণত হয়েছে জাদুকরী গুণসম্পন্ন অতি উচ্চমার্গীয় শিল্পকর্মে। কুজিন (Cuzin) এ সম্পর্কে বলেন যে :

> 'আজকের শিল্প সমালোচকেরা ছবিটির রহস্যময়তা এবং সুসমন্বয়তার উপর বেশি নজর দেন। কিন্তু প্রথমদিককার শিল্প ঐতিহাসিকেরা এর অসাধারণ বাস্তবতার প্রতি বেশি জোর দিয়েছেন, বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন হাস্যময় অধর এবং উজ্জ্বল চোখের কথা।'[২]

গিওর্গিও ভাসারি (Giorgio Vasari) তার ভিঞ্চির জীবনীগ্রন্থ Lives of the Painters'-এ লিখেছেন :

> 'মোনালিসাকে মনে হয় না যে আঁকা হয়েছে। বরং রক্তমাংসের প্রকৃত মানবীই মনে হয় তাকে। খুব কাছাকাছি থেকে কেউ যদি তার কণ্ঠের দিকে তাকিয়ে থাকে তবে সে হলফ করেই বলতে পারবে যে মোনালিসা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে।'[৩]

লিওনার্দোর ছবির এই বাস্তবতা এসেছে তার বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ থেকে। মানব এনাটমি ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে তিনি আকৃতির গাণিতিক সিস্টেম এবং পারসপেক্টিভ আবিস্কার করেছিলেন। এই পারসপেকক্টিভই তিনি ব্যবহার করেছিলেন মোনালিসার ক্ষেত্রে। মোনালিসার শরীরের তুলনায় মাথা এবং চোখ কিছুটা বেশি ঘোরানো ছিল দর্শকের দিকে। ভিঞ্চি সাবজেক্ট এবং পটভূমিকার অবজেক্ট এর পার্থক্যও পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং মোনালিসার পটভূমিকায় গভীরতার বিভ্রম তৈরি করার জন্য এরিয়াল পারসপেক্টিভ ব্যবহার করেছিলেন। কোন বস্তু দূরত্বের দিক থেকে

যত দূরে থাকবে তার স্কেল তত ছোট হবে, রঙ যত অনুজ্জ্বল হবে বহির্সীমা তত অস্পষ্ট হবে। এ বিষয়ে কুজিন বলেন :

> 'লিওনার্দো, আকাশ, মাটি, বায়ুমণ্ডল এবং আলো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। কাজেই তার এপ্রোচ ছিল বৈজ্ঞানিকের মত কিন্তু তিনি অসাধারণ শৈল্পিক এবং সুচারুরূপে একে পরিণতি দিয়েছিলেন তার চিত্রকর্মে। একই চিত্রকর্মে আমরা কোমল অঞ্চল যেমন মেঘ থেকে চলে যেতে পারি চরম জটিলতায় এবং চমৎকার ডিটেইলসে। উদাহরণস্বরূপ, মোনালিসার পোশাকের গলার কাছে সূক্ষ্ম পরস্পর বিজড়িত এমব্রয়ডারি রয়েছে। এগুলোর বিভিন্ন এলাকার বৈসাদৃশ্য এমন এক ধরনের প্রাঞ্জলতা তৈরি করেছে যা চিত্রকর্মে বিরল। সবকিছু মিলে মোনালিসা এতই স্বাভাবিক এবং এতই পরিচিত যে, আমরা ভুলেই যাই এটা ষষ্টদশ শতাব্দীর শুরুতে এই চিত্রকর্মটি কি অসাধারণ আবিস্কার ছিল।'[৪]

ভাসারি তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, লিওনার্দোর সময়েই দূর দূরান্ত থেকে শিল্পীরা তার স্টুডিওতে ভিড় জমাতো মোনালিসাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য। তরুণ শিল্পী রাফায়েল লিওনার্দোর সৃষ্টিকর্ম নিয়ে এমনই আচ্ছন্ন ছিল যে, সে নিজেও মোনালিসার আদলে বেশ কিছু প্রতিকৃতি এঁকে ফেলেছিল। এদের মধ্যে আবার কয়েকটি মোনালিসার সাথে দারুণভাবে সাদৃশ্যও ছিল। তবে বলতেই হয় সেগুলোতে দা ভিঞ্চির মাস্টারপিসের নাটকীয়তা অনুপস্থিত ছিল।

রহস্যময় হাসি

পাঁচ শতাব্দী ধরে লোকজন মোনালিসার হাসিকে দেখে চলেছে চরম বিস্ময় নিয়ে, বিহ্বলের মত। পৃথিবীর সমস্ত রহস্যের আধার যেন তার হাসি। এই মনে হবে মোনালিসা হাসছে, পরক্ষণেই দেখা যাবে সে হাসি মিলিয়ে গেছে। কী আছে মোনালিসার ঠোঁটে? লিওনার্দো কিভাবে মোনালিসার মুখে এই রহস্যময় অভিব্যক্তি তুলে দিয়েছিলেন? অন্য কোন শিল্পীরা তা পারেননি কেন? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেকেই এর কারণ হিসাবে ফুমাটো কৌশলকেই দায়ী করেছেন।

হার্ভাডের নিউরো সায়েন্টিস্ট ড. মার্গারেট লিভিংস্টোন (Margaret Livingstone) এর মতে এর আরো শক্তিশালী অন্য একটা ব্যাখ্যা আছে। তার মতে মোনালিসার হাসি ক্ষণে ক্ষণে আসা যাওয়ার জন্য তার দুর্বোধ্য অভিব্যক্তি মোটেই দায়ী নয়। বরং মানুষের দর্শনেন্দ্রিয় যেভাবে ডিজাইন করা তাই এর মুখ্য কারণ।

বিশ্বজগতকে দেখার জন্য মানব চোখের সুস্পষ্ট দুটো আলাদা এলাকা রয়েছে। কেন্দ্রীয় এলাকাকে বলা হয় ফোভিয়া। এখান দিয়েই মানুষ বর্ণ দেখতে পায়, অক্ষর পড়তে পারে এবং খুঁটিনাটি সবকিছুকে আত্মস্থ করতে পারে। ফোভিয়ার চারপাশের এলাকা যাকে বলা হয় পেরিফেরাল, তা দিয়ে মানুষ সাদা-কালো, গতি এবং ছায়া দেখে থাকে।

মানুষ যখন অন্য কারো মুখের দিকে তাকায় তখন বেশির ভাগ সময়ই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সেই ব্যক্তির চোখের দিকে। কাজেই ড. লিভিংস্টোনের মতে যখন কোনো ব্যক্তির দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয় মোনালিসার চোখের ওপর তখন তার তুলনামূলকভাবে কম নির্ভুল প্রান্তিক দৃষ্টি এসে পড়ে মুখের ওপর। যেহেতু প্রান্তিক দৃষ্টি খুঁটিনাটির বিষয়ে মোটেই আগ্রহী নয়, কাজেই স্বাভাবিকভাবে তার কাছে ধরা পড়ে মোনালিসার চোয়ালের হাড়ের ছায়াগুলো।

এই ছায়াই হাসির রূপ নেয়। কিন্তু যখনই দর্শকের চোখ সরাসরি মোনালিসার মুখের ওপর পড়ে, তার কেন্দ্রীয় দৃষ্টি ছায়াকে আর দেখে না। ড. লিভিংস্টোনের মতে মোনালিসার মুখের দিকে তাকিয়ে কখনোই তার হাসি দেখতে পাওয়া যাবে না। ক্ষণে ক্ষণে হাসির আসা-যাওয়া ঘটতে থাকে কারণ মানুষ তাদের সৃষ্টি মোনালিসার মুখের বিভিন্ন জায়গায় সরাতে থাকে বলে। মোনালিসার মধ্যে রসিকতা করার একধরনের সকৌতুক প্রবণতা আছে। যখন আপনি অন্য দিকে তাকিয়ে থাকবেন তখন সে আপনার পিছনে হাসবে। আর আপনি তার দিকে তাকানোর সাথে সাথেই সে তার হাসি বন্ধ করে দেবে।

অভিনেত্রী জিনা ডেভিসের মধ্যে মোনালিসা এফেক্ট আছে। সবসময় মনে হয় হাসি যেন ঝুলে আছে ঠোঁটে। এমনকি যখন হাসেন না তখনও মনে হয় হাসছেন। ড. লিভিংস্টোনের মতে, যেহেতু জিনা ডেভিসের চোয়ালের হাড় খুবই দৃশ্যমান সেকারণেই এরকম মনে হয়।

মোনালিসার রহস্যময় হাসির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও এর নান্দনিক রূপের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ড. লিভিংস্টোন। কাজেই এই রহস্যটুকুকে হরণ করে এর প্রতি মানুষের আগ্রহকে কেড়ে নিতে চাননি তিনি।

> 'আমি চাই না লিওনার্দোর রহস্যটুকু কেড়ে নিতে। অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী জীবন থেকেই এই রহস্যটুকু নিয়েছিলেন, কিন্তু কেউই তা খেয়াল করেননি। আমাদের পাঁচশ' বছর লেগেছে তা উদ্ধার করতে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কেন অন্য শিল্পীরা এটা নকল করতে পারেন নি। মোনালিসার খুব ভাল নকল করতে হলে যা করতে হবে তা হচ্ছে আঁকার সময় এর মুখের থেকে অন্যদিকে তাকিয়ে নিতে হবে। এতো সহজ জিনিসটা অন্যেরা যে কেন পারেনি সেটাও এক রহস্য'। [৫]

সুখী মোনালিসা

আবেগ চিহ্নিতকরণ সফটওয়ার ব্যবহার করে ইউনিভার্সিটি অব আমস্টারডামের কম্পিউটারে মোনালিসাকে বিশ্লেষণ করা

হয়েছে। এই বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে মোনালিসা ৮৩ শতাংশ আনন্দিত, ৯ শতাংশ বিরক্ত, ৬ শতাংশ আতংকিত এবং ২ শতাংশ ক্রোধান্বিত। আবেগ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কম্পিউটার সফটওয়ারটি ঠোঁটের বক্রতা, চোখের চারপাশের কুঞ্চনকে বিবেচনায় নিয়ে থাকে।

যতটা না সিরিয়াস গবেষণা, তার চেয়ে অনেক বেশি মজা হিসেবেই আমস্টারডামের গবেষকরা এই পরীক্ষাটি করেছিলেন। ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় এর সহযোগিতায় নির্মিত আবেগ চিহ্নিতকরণ এই সফটওয়ার এর মাধ্যমে মোনালিসার আবেগকে চিহ্নিত করার জন্য প্রথমে মোনালিসাকে স্ক্যান করা হয়। গবেষণার সাথে জড়িত প্রফেসর হ্যারো স্টকম্যান (Harro stokman) বলেন যে, গবেষকরা জানেন যে এই গবেষনা খুব একটা বৈজ্ঞানিক নয়, কেননা এই সফটয়ার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে ধরতে অক্ষম। অনেকেই মোনালিসার চোখের যৌন ইঙ্গিত বা তাচ্ছিল্য খুঁজে পান তা সনাক্ত করতে পারেনি এই সফটওয়ার। এছাড়া এই সফটওয়ার শুধুমাত্র ডিজিটাল ফিল্ম বা ইমেজকেই শুধুমাত্র ব্যবহার করতে পারে, এই ব্যক্তির বর্তমান আবেগকে সঠিকভাবে সনাক্ত করার জন্য প্রাথমিকভাবে তার নিরপেক্ষ আবেগশূন্য অবস্থার ছবি প্রয়োজন হয়। মুখ্য গবেষক নিকু সেবে (Nicu Sebe) এই চ্যালেঞ্জকে সিরিয়াসলি নেন এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বংশোদ্ভূত দশ জন মেয়ের মুখচ্ছবিকে ব্যবহার করে তিনি নিরপেক্ষ অভিব্যক্তির একটি ইমেজ তৈরি করেন। তারপর তিনি এই ইমেজকে মোনালিসার মুখের সাথে তুলনা করে ছয়টি আবেগ আনন্দিত, বিস্মিত, ক্রোধান্বিত, বিরক্ত, আতঙ্কিত এবং বিষাদগ্রস্তে ভাগ করেন। এই সফটওয়ার কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে স্টকম্যান বলেন :

> 'মূলত এটা মাকড়শার জালকে মুখের উপর ফেলে ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে ফেলার মত। তারপর আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নাকের স্ফীতি বা চোখের চারপাশের বলিরেখাগুলোর পার্থক্যকে বিশ্লেষণ করবেন এর আবেগকে চিহ্নিত করার জন্য।' ৬

এই গবেষণার সঙ্গে জড়িত নন এমন বায়োমেট্রিক্সরা বলেন, যদিও এটাই মোনালিসার জন্য শেষ কথা নয় তথাপি এই গবেষণার ফলাফল যথেষ্ট আগ্রহ উদ্দীপক। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর আইডেন্টিফিকেশন টেকনোলজীর ডিরেক্টর ল্যারী হোরানক (Larry Hornak) বলেন যে-

> 'মুখচ্ছবি সনাক্তকরণ টেকনোলজির দ্রুতগতিতে উন্নতি হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আবেগ সনাক্তকরণ এখনো আতুরঘরেই পড়ে আছে। তবে মনে হচ্ছে ছোট হলেও তারা একটা ডাটা সেটকে ব্যবহার করেছেন। নতুন ক্ষেত্র হিসাবে এই কাজ খুব একটা ফেলে দেয়ার মতোও নয়। গবেষণার ফলাফল যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। জনগণের আগ্রহের বিষয়গুলোতে টেকনোলজির ব্যবহার সবসময়ই মজাদার, এবং মাঝে মাঝে আপনি খুবই সাধারণ ফলাফলও পেয়ে যেতে পারেন।[৭]

স্যান জোস বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেট্রিক্স গবেষক জিম ওয়েম্যান (Jim Wayman) হোরনাকের সাথে একমত পোষণ করে বলেন যে–

> 'এটা একধরনের ভেল্কিবাজি, সিরিয়াস কোনো বিজ্ঞান নয়। কিন্তু মজা হিসাবে এটা দারুণ এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এতে কারো তো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না।'[৮]

হাসির অন্তরালের নারী

মোনালিসার প্রকৃত ইতিহাস এর রহস্যময় হাসির মতোই রহস্যের চাদরে মোড়া। এই প্রতিকৃতির সবচেয়ে পুরোনো বর্ণনা পাওয়া যায় গিওর্গিও ভাসারির লেখায়। ভাসারি যদিও মোনালিসা নিয়ে দারুণভাবে উচ্ছ্বসিত ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে তিনি কখনোই মোনালিসাকে স্বচক্ষে দেখেননি। কারণ তিনি যখন দা ভিঞ্চির জীবনী লেখেন তখন মোনালিসা ছিল ফ্রান্সে। অবশ্য ভাসারি লিওনার্দোর শিষ্য এবং পরবর্তীকালে তার সমস্ত শিল্পকর্মের উত্তরাধিকারী ফ্রান্সেসকো মেলজির সাথে সাক্ষাৎ করেন। মেলজিই তাকে মোনালিসা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করেন।

ভাসারি তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, লিসা ছিলেন ফ্লোরেনসের অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী রেশম ব্যবসায়ী ফ্রান্সেসকো ডেল গিওকন্ডোর চতুর্থ স্ত্রী। প্রতিকৃতিটি আঁকা প্রায় শেষ হওয়ার সময়ে লিসার বয়স ছিল ছাব্বিশ বা সাতাশ। এক সন্তানের জননী ছিল সে। অবশ্য তার সেই সন্তান জন্মের পর পরই মারা যায়। লিওনার্দো তার এই প্রতিকৃতিটির কোন নামকরণ করেন নাই। যেহেতু লিসা ছিল গিওকন্ডোর স্ত্রী, সে কারণে ইটালিতে এই চিত্রকর্মকে ডাকা হয় লা গিওকন্ডো নামে। ইংরেজি ভাষাভাষী অঞ্চলে লিসার নামে ছবিটির নাম হয়ে মোনালিসা। ইটালিয়ান ভাষায় মোনা হচ্ছে সম্মানসূচক পদবি। অনেকটা ম্যাডামের মত। আর এ কারণেই এ প্রতিকৃতিটি মোনালিসা নামে ডাকা হয়ে থাকে।

ভাসারি আরো উল্লেখ করেন যে, ছবি আঁকার সময় মোনালিসার মনোরঞ্জনের জন্য লিওনার্দো ভাড়া করা লোকজন দিয়ে গান-বাজনার ব্যবস্থা করে ছিলেন।[৯] এমনকি তাকে হাসিখুশি এবং উৎফুল্ল রাখার জন্য পেশাদার ভাঁড়েরও ব্যবস্থা ছিল।

অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, মোনালিসার হাসি লিওনার্দোর একধরনের তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়। ইটালিতে গিওকন্ডো শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে– উৎফুল্ল, উল্লসিত, আনন্দিত। লিওনার্দো হয়তো তার নামকেই কৌতুকের আকারে হাসির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এ ধরনের কৌতুকের প্রতি ভিঞ্চির যে বেশ অনুরাগ ছিল তা ইতিহাসই প্রমাণ দেয়।

ভাসারির সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও শত শত বছর ধরে প্রায় ডজনখানেক নারী আলোচনায় উঠে এসেছে মোনালিসা হওয়ার দাবিদার হয়ে। কেউ কেউ আবার এই প্রতিকৃতিটিতে কোনো মডেলই ব্যবহৃত হয়নি বলে মনে করেন। তাদের ধারণা লিওনার্দো কল্পনা থেকে তার আদর্শ রমণীর ছবি এঁকেছেন।

বহুদিন আগে থেকে আবার বেশকিছু সংখ্যক লোক দাবি করে আসছিলেন যে মোনালিসা ভিঞ্চিরই নিজস্ব চেহারার রমণীয় রূপ। এই ধারণাটির রহস্য উদঘাটনে গ্রাফিক আর্টিস্ট লিলিয়ান শোয়ার্জ (Lillian Shcwartz) ১৯৯৮ কম্পিউটার ভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটান। শোয়ার্জ লিওনার্দোর নিজের আঁকা নিজেরই প্রতিকৃতি নিয়ে একে উলটে দেন এবং কম্পিউটার স্ক্রিণে মোনালিসার প্রতিকৃতি পাশাপাশি রেখে তুলনা করেন। তিনি দেখতে পান যে, মোনালিসা এবং লিওনার্দোর নাক, মুখ, কপাল, চোয়ালের হাড়, চোখ এবং ভ্রু সবকিছুই একেবারে সরলরেখায় অবস্থান করছে। লিলিয়ান এই বলে তার উপসংহার টানেন যে, লিওনার্দো নারী মডেল নিয়ে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরে এই মডেলকে আর না পাওয়া যাওয়াতে তিনি নিজের চেহারার রমণীয় রূপকেই ব্যবহার করেছিলেন।[১০]

এডেলেইডের অপেশাদার শিল্প ঐতিহাসিক মেইক ভোগট-লুয়েরসেন (Maike Vogt-Luerssn) এর দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি মোনালিসার পরিচয় এবং সেই সাথে তার বিষণ্নতা এবং রহস্যময় হাসির পিছনের কারণটি উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন।

রেনেসার সময়কার শিল্পকলার প্রতি সুগভীর প্রণয়ের কারণে মেইক তার এই গবেষণা প্রজেক্ট হাতে নেন, যার সূত্রপাত হয়েছিল জার্মানিতে। প্রায় সতের বছরের গবেষণার পর মেইক এই বিশ্বাসে উপনীত হন যে, মোনালিসা ফ্লোরেনসের ধনাঢ্য রেশম ব্যবসায়ীর স্ত্রী নন। বরং সে হচ্ছে লিওনার্দোর প্রেমাকাংখী মিলানের প্রাক্তন ডাচেস ইসাবেলা অব এ্যারাগন।

মেইকের এই গবেষণার ফলাফল জার্মানিতে Who is Mona Lisa? In Search of Her Identity নামে গ্রন্থাকারে বের হয়েছে।

মেইক বলেন যে, মোনালিসার পরিচয়ের সূত্র মোনালিসা চিত্রকর্মসহ সেই সময়কার অন্যান্য চিত্রকর্ম, ডায়েরি এবং তৎকালীন সরকারি ও বেসরকারি রেকর্ডের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

ফ্যাকাশে হাসি এবং মোনালিসার সারা শরীরের গহনার অনুপস্থিতি ছাড়াও তার পরনে রয়েছে গভীর শোকের পোশাক। মোনালিসাকে যে বছর আঁকা হয় তার আগেরই বছরই ইসাবেলার মা মারা যায়। সেই সময় ডাচেসের বয়স ছিল মাত্র সতের বছর এবং সে ছিল সুদর্শন কিন্তু অসৎ চরিত্রের অধিকারী ডিউক অব মিলান গিয়ান গালিয়াজো II মারিয়া ফোরজার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী।

মোনালিসার সাদাসিধা বাদামী পোশাকের দৃশ্যমান উর্ধ্বাংশ হচ্ছে ফোরজা পরিবারের প্রতীক এবং এর নিচের সংযুক্ত গিটসমূহ এবং সুতাগুলো ভিসকন্টি এবং ফোরজা পরিবারের বন্ধনকে প্রতিনিধিত্ব করছে। মেইক উল্লেখ করেন যে, এই প্রতীকের কারণে মোনালিসা হতে পারে এমন মহিলার সংখ্যা মাত্র আটজন-এ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তিনি সংশ্লিষ্ট মহিলাদের বেশ কিছু প্রতিকৃতি চিহ্নিত করেন। এদের মধ্যে রয়েছে ক্যাটরিনা, ফোরজা, যার চুল ছিল হালকা লাল রঙ এর, ইসাবেলার শ্বাশুড়ী বোনা অব স্যাভয় এবং ইসাবেলার ননদ এ্যানা-মারিয়া, এঞ্জেলা, ইপোলিটা, বিয়ানকা, এমপ্রেস এবং বিট্রিসা। বলা বাহুল্য এদের কারো সাথেই মোনালিসার চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি, কাজেই খুব স্বাভাবিকভাবেই মোনালিসা হওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র দাবিদার হয়ে পড়ে ইসাবেলা।

মেইকের ধারণা যে তিনি মোনালিসার বিষণ্নতা এবং উৎফুল্লতার পিছনের কারণও বের করতে পেরেছেন।

কেন মোনালিসা এতো বিষণ্ন? ১৪৮৮ সালের শেষের দিকে ইসাবেলা যখন মিলানে আসে তখনই তার বিয়ে হয় ডিউক অব মিলানের সাথে। কিন্তু তাদের বৈবাহিক জীবনে বড় ধরনের সমস্যা ছিল। তার স্বামী ছিল মদ্যপ, নপুংসক এবং স্ত্রী নির্যাতনকারী।

মেইক বলেন যে,

> 'সেই সময়কার ডায়েরি লেখকেরা ডাচেস অব মিলান নামের চমৎকার এক রমণীর দুঃখ লিখে গেছে, যে তার মদ্যপ স্বামীর হাতে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হয়ে কাঁদতো। কিন্তু সেই রমণী ছিল দা ভিঞ্চির ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা সম্ভবত তার চেয়েও বেশি কিছু। সে কারণেই অসংখ্য আগ্রহী ক্রেতা থাকা সত্ত্বেও ভিঞ্চি তার মোনালিসাকে হাতছাড়া করেননি কিছুতেই। এটা ছিল প্রেমের গল্প। কিন্তু খুবই দুরূহ প্রেমের গল্প। ইসাবেলা ছিলেন সমাজের অতি উচ্চপর্যায়ের এবং শক্তিশালী অবস্থানের অংশ। অন্যদিকে ভিঞ্চি ছিলেন নেহায়েতই এক শিল্পী। তখনকার সমাজ এ ধরনের অসম সামাজিক অবস্থানের প্রেমকে মেনে নেয়ার মতো অবস্থায় ছিল না'।

ফ্লোরেনসের রেশম ব্যবসায়ীর স্ত্রী লা গিওকন্ডো মোনালিসা ছিলেন এই ব্যাপক স্বীকৃত ধারণাকে প্রত্যাখান করেছেন মেইক। তার মতে, গিওর্গি ভাসারিরর লিখিত বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে এটা ছিল ল্যুভর মিউজিয়ামের নিজস্ব অনুমান মাত্র। মেইকের নিজের ভাষায় :

> 'তারা জানতো না, মোনালিসা কে? কাজেই প্রথম যে বর্ণনা তারা পেয়েছে সেটাকেই তারা গ্রহণ করে নিয়েছে। এই বর্ণনা সাদামাটাভাবে মোনালিসার সাথে খাপও খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আসলে তা খাপ খায় নি। ল্যুভর যা কিছু বলেছে তার সব কিছুই অপ্রমাণিত এবং শুরু থেকেই বেশ কিছু গল্প ঐতিহাসিকেরা এর বিরোধিতা করে এসেছেন। মোনালিসা এবং ভাসারির বর্ণনাকৃত লা গিওকন্ডোর প্রতিকৃতির বর্ণনার মধ্যে গড়মিল রয়েছে।'[১২]

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র লেকচারার ক্রিস মার্শালদের মত শিল্প সমঝদারেরা অবশ্য মেইকের গবেষণাকর্মের সাথে একেবারেই পরিচিত নন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির সাথেও মোটেই একমত নন। ড. মার্শাল বলেন যে,

> 'যেহেতু ভাসারি তার স্মৃতির ওপর নির্ভর করে ষষ্টদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মোনালিসার বর্ণনা লিখেছেন, সে কারণেই লা গিওকন্ডো তত্ত্ব এখনো চালু রয়েছে।'[১৩]

পাঁচ সন্তানের জননী

গুইসেপ পালান্টি নামের ফ্লোরেনসের একজন শিক্ষক শহরের আর্কাইভগুলোতে দীর্ঘ পঁচিশ বছর গবেষণার পর সুস্পষ্ট প্রমাণ খুঁজে পান যে লিওনার্দোর পরিবার এবং রেশম ব্যবসায়ী ফ্রান্সেসকো গিওকন্ডোর পরিবার ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল।[১৪]

ভাসারির যে দাবি করেছিলেন মোনালিসা হচ্ছে গিওকন্ডোর স্ত্রী, সে বিষয়ে পালান্টির মনে কোন সন্দেহ নেই। কেননা ভাসারি ব্যক্তিগতভাবে গিওকন্ডো পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। লিসার বয়স যখন চব্বিশ তখন এই প্রতিকৃতিটি আঁকা হয় এবং খুব সম্ভবত লিওনার্দোর বাবাই তাকে এই কাজটি জুটিয়ে দিয়েছিল। এ ধরনের কাজ লিওনার্দোর বাবা আগেও অন্তত একবার করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। টাকা পয়সার ব্যাপারে লিওনার্দো এতোই অগোছালো ছিল যে তার বাবাকে এ ধরনের সাহায্যের হাত মাঝে মাঝেই বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল।

পালান্টির ভাষ্য অনুযায়ী লিসা পাঁচ সন্তানের জননী ছিলেন। লিসা এবং ফ্রান্সেসকো দম্পতির পাঁচ সন্তানের মধ্যে চার সন্তানেরই জন্মের রেকর্ড উদ্ধার করেছিলেন তিনি। পালান্টি তার গবেষণার ফলাফল ছোট্ট একটি বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

মোনালিসাকে তার রহস্য উদ্ধার করার জন্য অন্যান্য পণ্ডিত এবং গবেষকেরা পালান্টির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। রিকার্ডো নেনচিনি (Ricardo Nencini) বলেন যে,

> 'এই গবেষণা হয়তো সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্তভাবে প্রমাণ করতে পারবে না যে লিসা এবং মোনালিসা একই রমণী। কিন্তু যে ধরণের তথ্য প্রমাণ হাজির করা হয়েছে তাতে এরা যে একই নারী তা প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে।'[১৫]

অপহৃত মোনালিসা

১৯১১ সালের একুশে অগাস্ট সোমবার বিশ্ববিখ্যাত এই শিল্পকর্ম ল্যুভর মিউজিয়াম থেকে চুরি হয়ে যায়। ওই দিন সকালে মিউজিয়ামের কর্মচারীরা আবিস্কার করে যে মোনালিসা তার নিজের জায়গায় নেই। কিন্তু কর্মচারীরা ভেবে নেয় যে, মোনালিসাকে বোধহয় মিউজিয়ামের অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার তার অফিসে নিয়ে গেছে এর ফটো তোলার জন্য।

মঙ্গলবারের মধ্যে যখন ছবিটি স্বস্থানে ফিরে এলো না এবং জানা গেল যে, সেটা ফটোগ্রাফারের অফিসেও নেই, তখনই তা মিউজিয়াম কর্মকর্তাদের জানানো হয়। তাৎক্ষণিকভাবেই পুলিশকেও খবর দেওয়া হয় এবং তারা কিউরেটরের অফিসে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে সারা মিউজিয়ামের সর্বত্র ব্যাপক অনুসন্ধান চালায়। কিন্তু কোথাও মোনালিসার হদিস পাওয়া গেল না।

সংবাদপত্রে মোনালিসা চুরির ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর ফরাসি পত্রপত্রিকাগুলো চুরির বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে হাজির হয়। এক সংবাদপত্র দাবি করে যে, একজন আমেরিকান সংগ্রাহক এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। এবং এর নিখুঁত নকল করার পর নকল ছবিটি একসময় মিউজিয়ামে ফেরত পাঠানো হবে। অন্য এক সংবাদপত্র বলে যে, পুরো ঘটনাটাই আসলে ধোঁকাবাজি। কত সহজে ল্যুভর থেকে ছবি চুরি করা যায় তা দেখানোই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য।

চুরির রহস্য উদ্ধার করার জন্য কর্মচারীসহ আশেপাশে বসবাসকারী অসংখ্য লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সবচেয়ে

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে পুলিশ বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসোকেও এই চুরির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। পিকাসো এর আগে তার এক বন্ধু পিয়েরের কাছ থেকে দু'টি চোরাই প্রস্তরের ভাস্কর্য কিনেছিলেন। মোনালিসা চুরি হওয়ার কয়েকমাস আগে পিয়েরে ওই ভাস্কর্য দুটো ল্যুভর থেকে চুরি করেছিল। পিকাসো ভেবেছিল যে তার এই গুণধর বন্ধুটিই হয়তো মোনালিসাকেও চুরি করেছে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং ইমেজ হারানোর ভয়ে পিকাসো ভাস্কর্য দুটো মিউজিয়ামে ফেরত দেয়ার জন্য স্থানীয় এক পত্রিকা অফিসে হস্তান্তর করেন। তার নাম প্রচারিত হোক এটা পিকাসো চাননি। কিন্তু কেউ একজন এই ঘটনা পুলিশকে ফাঁস করে দেয়। তদন্তের পর অবশ্য পুলিশ নিশ্চিত হয় যে পিকাসো মোনালিসা চুরির বিষয়ে কিছুই জানতেন না।

সৌভাগ্যক্রমে চুরি যাওয়ার সাতাশ মাস পরে মোনালিসাকে উদ্ধার করা হয়। ভিনসেনজো পেরুজিয়া নামের একজন ইতালিয়ান মোনালিসাকে এক লাখ ডলারের বিনিময়ে ফ্লোরেনসের উফিজি গ্যালারীতে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল। পেরুজিয়া অবশ্য দাবি করে যে, টাকা নয় বরং দেশপ্রেমের কারণেই সে মোনালিসাকে চুরি করেছিল। একজন বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পীর বিশ্বখ্যাত শিল্পকর্ম ফ্রান্সে থাকবে এটা সে মেনে নিতে পারে নি।

ত্রিমাত্রিক বিশ্লেষণ

মোনালিসার গঠনবিন্যাস, স্টাইল এবং কিভাবে আরো ভালভাবে সংরক্ষণ করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য ন্যাশনাল রিসার্চ কাউনসিলের (NRC) সৌভাগ্য হয়েছিল এই প্রতিকৃতিকে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার। অত্যাধুনিক কলাকৌশলের মাধ্যমে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এই গবেষণায় NRC গবেষণা দল মোনালিসাকে স্ক্যান করে বিপুল সংখ্যক ডাটা সংগ্রহ করেন বিশ্লেষণ করার জন্য।

ল্যুভরের পেইন্টিং ডিপার্টমেন্টের অনুরোধে Centre de recherche et de restauration des musees de France (C2RMF) মোনালিসার ওপর গবেষণার কাজ নেয়। এই গবেষণা ছিল কোন পেইন্টিং এর ওপর নেয়া এখন পর্যন্ত সব চেয়ে ব্যয়বহুল গবেষণা। মডেলিং টেকনোলজী এবং থ্রিডি (ত্রিমাত্রিক) ইমেজিং এর ওপর ব্যাপক জ্ঞান এবং দক্ষতার কারণে এই প্রজেক্টের অংশ হিসাবে (C2RMF) ক্যানাডা ভিত্তিক গবেষনা প্রতিষ্ঠান NRC এর থ্রি ডি বিজ্ঞানীদের একটি দলকে আমন্ত্রণ জানায় গবেষণায় অংশ নেওয়ার জন্য।

এই গবেষণায় এনআরসি-র ভূমিকা ছিল মোনালিসার সম্মুখ এবং পশ্চাৎ দুইভাগই স্ক্যান করার মাধ্যমে প্রতিকৃতিটির সংরক্ষণযোগ্য একটি উচ্চ রেজুলিশন সম্পন্ন ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরি করা। ত্রিমাত্রিক এই মডেল ব্যবহার করা হয়েছিল তিনটি কাজে :

- পপলার প্যানেলের আকৃতির কতখানি বিকৃতি ঘটেছে তা সনাক্ত করা।
- ছবিটির সম্মুখ অংশের বৈশিষ্ট্যসমূহ, রঙ এর বিভিন্ন স্তর, প্যানেল এবং প্রতিকৃতিটির উপরভাগের চিড় বা ফাটলকে পরীক্ষা করা।
- ছবিটির সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং ভিঞ্চির ছবি আঁকার কৌশল বিশেষত ফুমাটো কৌশলকে বুঝতে সহায়তা করা।

প্যারিসে যাওয়ার আগে NRC টিমের সদস্যরা স্ক্যানিং প্রক্রিয়ার অনুপুঙ্খ সিম্যুলেশন পরীক্ষা করেন। মোনালিসাকে তার পরিবেশ সংরক্ষণ চেম্বার থেকে বছরে মাত্র একবার এক রাতের জন্য পরীক্ষা করার জন্য বের করা হয়। NRC গবেষকরা ২০০৪ সালের ১৮ থেকে ২০শে অক্টোবরের মধ্যে দুটি মহামূল্যবান রাত পেয়েছিলেন মোনালিসার সামনের, পেছনের এবং পার্শ্বের অংশের ত্রিমাত্রিক স্ক্যানের জন্য।

NRC টিম এই প্রজেক্টের জন্য একটি বহনযোগ্য ত্রিমাত্রিক রঙিন লেজার স্ক্যানার তৈরি করেছিলেন। মে মাসে C2RMF এর রেঁনোর (Renoir) আঁকা বেশ কিছু ছবি স্ক্যানের মাধ্যমে এই বহনযোগ্য স্ক্যানারটি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করা হয়। ত্রিমাত্রিক টেকনোলজি তৈরির নেতৃত্বদানকারী গবেষক ফ্রাঙ্কোয়েস ব্লেইস (Francois Blais) মোনালিসার ক্রমশ পরিবর্তনশীল রঙ-এর অনুজ্জ্বলতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য নতুন এলগোরিদম এবং গাণিতিক মডেল উদ্ভব করেন।

এন আর সি বিজ্ঞানী মার্ক রিওক্স মোনালিসার ত্রিমাত্রিক ছবি বিশ্লেষণ করছেন ত্রিমাত্রিক মডেল নিখুঁতভাবে মোনালিসার প্যানেলের বেঁকে যাওয়ার পরিমাণকে চিহ্নিত করে। মোনালিসাকে আঁকা হয়েছিল যে পপলার কাঠের প্যানেলে তার মধ্যে ডান পাশে আশে পাশের এলাকার চেয়ে বারো মিলিমিটার উঁচু উত্তলাকৃতির বিকৃতি তৈরি হয়েছে। অবশ্য এই বিকৃতি এখন পর্যন্ত মোনালিসার হাসির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়নি।

ত্রিমাত্রিক এই বিশ্লেষণের সবচেয়ে বড় পাওনা হচ্ছে লিওনার্দোর অংকনকৌশলের রহস্য উদ্ধার করতে পারা।

লিওনার্দো তার এই অংকন কৌশলকে ফুমাটো বলতেন। ইতালীয়ানে যার অর্থ হচ্ছে ধোঁয়া। কিন্তু ধোঁয়ার মধ্যে সত্যিকারের যা হারিয়ে গেছে তা হচ্ছে কিভাবে এই কৌশল মোনালিসাতে প্রয়োগ করেছিলেন ভিঞ্চি।

চিত্র : ত্রিমাত্রিক বিশ্লেষণে মোনালিসার ছবি

NRC র হাই রেজুলেশন রঙিন ত্রিমাত্রিক লেজার স্ক্যানিং টেকনোলজীতে মোনালিসাতে লিওনার্দোর তুলির আচড় সাগরের মৃদুমন্ড তরঙ্গের মতো এসেছে। এনআরসির গবেষক দলের সদস্য জন টেইলর (John Taylor) বলেন যে,

'মোনালিসায় আমরা তুলির আচড়ের বিস্তৃত কোন চিহ্ন দেখতে পাই না। এটা খুবই হালকাভাবে আঁকা এবং খুবই মসৃণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কোঁকড়ানো চুলের ডিটেইলস প্রবলভাবে দৃশ্যমান। কাজেই বলা যায় যে আমরা যে ধরণের কৌশল আগে কখনো দেখিনি। এটা লিওনার্দোর সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বকীয়তা।'[১৬]

কিভাবে তাহলে ভিঞ্চি মোনালিসাকে এঁকেছিলেন? টেইলর বলেন যে, যদিও ভাবা হয়ে থাকে যে ভিঞ্চি তার আঙুলকে ব্রাশ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু মোনালিসাতে সে ভাবে তার আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায়নি, যেটা ভিঞ্চির অন্যান্য ছবিতে পাওয়া যায়। শিল্প বিশেষজ্ঞরা জানেন যে, গভীরতার পারসেপশন, আয়তন, ধরন এবং হালকা বা গাঢ়তা আনার জন্য ফুমাটো কৌশলে স্বচ্ছ রঙে এর স্তর একের পর এক প্রলেপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ফ্রাস্কোয়েস ব্লেইস বলেন যে :

'স্ক্যানিং এর মাধ্যমে আমরা দেখাতে সক্ষম হয়েছি যে, গাঢ় এলাকা যেমন চোখ অবশ্য মোটা রং এর স্তর দিয়ে গঠিত। যার মানে হচ্ছে এগুলো অসংখ্য পর্যাক্রমিক পাতলা স্বচ্ছ রং এর আস্তরণের সমন্বয়। তা সত্ত্বেও, রেঁনেসার এই বিস্ময়কর শিল্পী কিভাবে তার রঙ-এর স্তর এবং তৈল মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন তা এখনো রহস্যই রয়ে গেছে।'[১৭]

বর্তমানে NRCর গবেষকরা মোনালিসার নকল প্রতিকৃতিগুলো যেগুলো কাঠের উপর ফুমাটো কৌশলে আঁকা হয়েছে সেগুলোর উপর কাজ করছেন, ত্রিমাত্রিক লেজার স্ক্যানিং এবং ছবির উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া ভালভাবে বোঝার জন্য। আর এর মাধ্যমেই তারা আশা করছেন যে, একদিন ভিঞ্চির ফুমাটো রহস্যকে তারা ভেদ করতে পারবেন।

ত্রিমাত্রিক গবেষণার সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত ব্লেইস এর সম্ভাবনা নিয়ে দারুণভাবে আশাবাদী। তিনি বলেন যে,

'আমরা যে ত্রিমাত্রিক ইমেজ পেয়েছি যা আসল মোনালিসার খুবই কাছাকাছির। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা একটা ডিজিটাল কপি মাত্র। আমরা এখন চিন্তা ভাবনা করা শুরু করেছি কিভাবে ভিজুয়ালাইজেশন এলগোরিদম তৈরি করা যায়, যা মোনালিসার চোখের উজ্জ্বল গভীরের অনুভূতিকে করায়ত্ত্ব এবং তা পুনর্নির্মাণ করতে পারবে।'[১৮]

অন্তঃসত্ত্বা মোনালিসা

মোনালিসার ত্রিমাত্রিক ছবি বিশ্লেষণকারী গবেষকরা বলেছেন যে, প্রতিকৃতি আঁকার সময় মোনালিসা হয় অন্ত:সত্ত্বা নতুবা সদ্য প্রসূতি ছিল। আর এ ধারণার মূল নিহিত রয়েছে মোনালিসার পোশাকের মধ্যে।[১৯]

স্ক্যান থেকে মোনালিসার কাঁধে মিহি সুতায় বোনা চমৎকার একটি আচ্ছাদনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রখ্যাত ফরাসি মিউজিয়াম গবেষক মিশেল মেনু বলেন যে, এই ধরনের আচ্ছাদন রেঁনেসার সময়কালীন গর্ভবতী বা সদ্য প্রসূতি ইতালিয়ান মহিলারা ব্যবহার করতেন।

ছবিটি পুরোনো হওয়ার সাথে সাথে এই আচ্ছাদন গাঢ় বর্ণ ধারণ করেছে। ঘন কালো বার্নিশের কারণে মোনালিসা কি রঙ এর পোশাক পরে ছিলেন তা বলা দুরূহ। এই রঙ কালো থেকে বাদামী এমনকি সবুজ বলেও কেউ কেউ অনুমান করেছেন। মোনালিসার কাঁধে বিছানো আচ্ছাদনকে কখনো কখনো চাদর বা স্কার্ফ হিসাবেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কিন্তু ইনফ্রা-রেড রিফ্লেক্টোগ্রাফি থেকে প্রাপ্ত ইমেজ ভিন্ন কাহিনী বর্ণনা দেয়। এই স্বচ্ছ আছাদনকে বলা হয় গুয়ারনেলো। স্যান্ড্রো বটিসেলির (Sandro Botticelli) আঁকা পেটের উপর হাত বিছিয়ে রাখা গর্ভবতী মহিলার `Portrait of a Lady'- র আচ্ছাদনের সাথে এর আবিকল মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিদিন মোনালিসাকে নিয়ে লেখা অসংখ্য কবিতা আর প্রেমপত্রে ছেয়ে যায় ল্যুভর মিউজিয়াম্ বাধভাঙ্গা জোয়ারের মতো মোনালিসা প্রেমিকরা ভিড় জমায় ল্যুভরে শুধুমাত্র মোনালিসাকে এক নজর দেখার জন্য, তার সাথে একটা ছবি তোলার জন্য। চিত্রকলার ইতিহাসে এতো আলোচিত এবং সমালোচিত চিত্রকর্ম আর হয়নি। রেঁনেসার মতই চিত্রকলার জগতেও বিপ্লব বয়ে এনেছিল রেনেঁসার সময়কালীন এই প্রতিকৃতি। মোনালিসার চেহারা আজ সারাবিশ্বে সুপরিচিত। বিশ্বের বিভিন্ন মিউজিয়াম থেকে শুরু করে, মদের বোতল, বিলবোর্ড হেন কোন জায়গা নেই যেখানে মোনালিসাকে ব্যবহার করা হয়নি। যুগেযুগে এই চিত্রকর্ম প্রভাবিত করেছে নবীন শিল্পীদের, আগ্রহী করে তুলেছে চিত্রকলার শৈল্পিক ভূবনে। কুজিন বলেন যে :

> 'মোনালিসার পরবর্তী সময়ের প্রতিকৃতির সম্পূর্ণ ইতিহাসই মোনালিসার ওপর নির্ভর করেছে। শুধু ইতালীয় রেঁনেসাকালীন প্রতিকৃতিসমূহই নয়, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পিকাসো থেকে শুরু করে প্রত্যেক শিল্পীরই মোনালিসা নিয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। পাশ্চাত্যের সকল প্রতিকৃতি চিত্রকলারই শেকড় হচ্ছে মোনালিসা।'[২০]

তথ্যসূত্র :

1. Mary Rose Storey, *Mona Lisa*. New York, Harry N. Abrams, 1980.
2. http://www.pbs.org/treasuresoftheworld/a_nav/mona_nav/mnav_level_1/3technique_monafrm.html

Giorgio Vasari, *Lives of Painters, Sculptors and Architects*. London: J.M. Dent & Sons, 1963.

3. http://www.pbs.org/treasuresoftheworld/a_nav/mona_nav/mnav_level_1/3technique_monafrm.html
4. http://www.sfgate.com/cgibin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2000/11/27/MN127339.DTL
5. http://www.livescience.com/history/ap_051215_mona_lisa.html
6. Ibid
7. Ibid

Giorgio Vasari, *Lives of Painters, Sculptors and Architects*. London: J.M. Dent & Sons, 1963.
Stuart A. Kallen and P.M. Boekhoff, The Importance of Leonardo Da Vinci. Lucent Books, 2000.
http://www.theage.com.au/articles/2004/06/24/1088046208817.html?from=storylhs
Ibid
Ibid
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2004/08/01/wmona01.xml&sSheet=/news/2004/08/01/ixworld.html
Ibid
http://iit-iti.nrc-cnrc.gc.ca/projects-projets/monalisa-lajoconde_e.html
Ibid
Ibid
http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/5384822.stm
http://www.pbs.org/treasuresoftheworld/a_nav/mona_nav/mnav_level_1/3technique_monafrm.html

KieZv

ড. ইউনূস-শান্তিপুরস্কার

মৌ মধুবন্তী

গ্রামীণ ব্যাংক যদি ঋণ না দিতো
বাংলার কতো নারী মারা যেতো
বলো বাংলার অর্থমন্ত্রী ।

এম্বিশানের এক রকেট চড়ে
বাংলার মাঠে ঘাটে বীজ বুনে
যে ছেলে আজ পেলো শান্তি পুরস্কার
কেন আজ তাকে করো হে তিরস্কার ।

অভিনন্দনের নেই ক্রোড়পত্র
সমালোচনার সব অস্ত্র-শস্ত্র
সাজিয়ে নেমেছ মাঠে
উপড়ে দেবে ড. ইউনূসকে
বলো চিৎকার করে বিশ্বকে
সে তোমাদের করেছে অনেক ক্ষতি
নারীকে দিয়েছে জীবনের স্বাদ
তোমার জন্য তো তিক্ত পরমাদ
তুমি হুলো বেড়ালের মতো ছোটো
তুমি মেনী বেড়ালের মতো খাটো
তুমি উলটো রকেটে চড়ো
তাই বোঝ না কে কতো বড়ো
করো চিৎকার করো আরো জোরে
কোলে নিয়ে নাচো অমর্ত্য সেনে
এখনো হয়ে আছো গোবেচারা
বাঙালি
হওনি এখনো অহংকারী বাংলাদেশী
তোমাদের নেই কোনো বাদ্যযন্ত্রী
নেকাবছাড়া বাংলার মন্ত্রী ।

ছাড় বলছি, নারীর আঁচল টানা
বাংলার বুকে শান্তির পতাকা নামা
আনন্দের পতাকা নামা
ছাড় বলছি, বিদেশে বিদেশে ভিক্ষা মাগা
বাংলার বুকে শান্তির পতাকানামা
আনন্দের পতাকা নামা ।

অক্টোবর ১৭, ২০০৬

প্রবন্ধ

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা বনাম কোরানিক বিজ্ঞান

জাহেদ আহমদ

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে
আমরা তখনও পিছে,
বিবিতালাকের ফতোয়া খুঁজছি
হাদীস ও ক্বোরাণ চষে।

বাহিরের দিকে যত মরিয়াছি
ভিতরের দিকে তত
গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি
গরু-ছাগলের মত।
-কাজী নজরুল ইসলাম

এক.

ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে কলেজের ইংরেজি এন্থলজিতে পড়া একটি গল্প আমার মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল। অনেকেই গল্পটির কথা জেনে থাকবেন। আমেরিকান লেখিকা মারজারি কিনান রাওলিন্স-এর 'এ মাদার ইন ম্যানভিল' (*A Mother in Manville*)। কাহিনী এ রকম লেখালেখি বিষয়ক একটা এসাইনমেন্ট-এর কাজে লেখিকা মারজারি নর্থ ক্যারোলিনার পাহাড়ে অবস্থিত একটি অনাথ বাচ্চাদের আশ্রমে কিছুদিন কাটান। সেখানে জেরি নামে একটা বাচ্চার সাথে তার পরিচয় ঘটে। জেরি লেখিকাকে প্রতিদিন আগুনপোহানোর কাঠ কেটে দিত। সে ছিল প্রত্যয়ী, পরিশ্রমী এবং অত্যন্ত মেধাবী। জেরি আলাপ প্রসংগে লেখিকাকে জানায়, তার মা জীবিত এবং মাঝে মাঝে তাকে দেখতেও আসেন এটাসেটা উপহার নিয়ে। গল্পের শেষ পর্যায়ে লেখিকা আশ্রমে চাকুরীরত জনৈক মহিলার কাছ থেকে জানতে পারেন, জেরীর মা-বাবা কেউই আসলে জীবিত নেই এবং তাকে কেউ দেখতে আসার কথাও ঠিক না। এখানেই গল্পের সমাপ্তি ঘটলেও পাঠক-পাঠিকার মনে কাহিনীটি একাধিক প্রশ্নের জন্ম দেয়। জেরী কি তাহলে মিথ্যুক? কেন সে ফাঁদিয়ে ওরকম একটি গল্পলেখিকাকে বলতে গেল? সম্ভাব্য ব্যাখ্যা একাধিক, জেরী অনাথ বালক হিসেবে কারো করুণা বা সহানুভূতি নিতে চায়নি। অথবা, লেখিকাকে দেখে তার মায়ের কথা মনে পড়েছে; তাই নিজের একাকিত্ব ও অসহায়ত্বকে চেপে রাখতে কল্পনায় সে একজন মাকে সৃষ্টি করেছে। তা না হলে সম্ভবত তার আত্ম পরিচয়ের সংকট দেখা দিত।

উপরের গল্পটি বিশেষভাবে মনে পড়ল সম্প্রতি যখন পত্রিকার পাতায় একটি 'বিশেষ' লেখার ওপরে চোখ বুলাচ্ছিলাম। উক্ত লেখাটিতে লেখক মরিয়া হয়ে উঠেছেন দেখাতে যে, আল-কোরানের সাথে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের বিস্ময়কর (?) মিল রয়েছে। বেশ কিছু দেশী-বিদেশী রেফারেন্সও তিনি টেনে এনেছেন যা বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান গবেষণার পদ্ধতির সাথে অপরিচিত পাঠক-পাঠিকাদের খুব সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারবে; তাঁরা মনে করতে পারেন, কোরান বোধ হয় একধরনের বিজ্ঞানগ্রন্থ। হয়ত এও ভাবতে পারেন (বা ভাবেন)- প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগেই বিজ্ঞানের এমনসব তথ্য পবিত্র কিতাবে লেখা হয়েছিল, যা আধুনিক জগতে বিজ্ঞানীরা পরিশ্রমলব্ধ গবেষণার মাধ্যমে মাত্র জানতে শুরু করেছেন! তবে এসব বিশ্বাস মুসলমানদের মাঝে একেবারে নতুন নয়। সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, 'আমাদের ক্বোরাণেই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে। এগুতে পারছি না কেবল শয়তানের ওয়াসওয়াসে।' কিংবা 'কাফির-নাসারারা যে এত উন্নতি করছে, তা আসলে আমাদের ক্বোরাণ গবেষণা করে, অথচ আমরা নিজেরা পারছি না সঠিক আমলের অভাবে।' কিন্তু আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন বলে দিতে পারলেন না, 'সঠিক আমল' জিনিসটি আসলে কী কিংবা, বক্তা নিজেইবা কেন 'সঠিক আমল'টি অভ্যাস করে কোটি কোটি মুসলমানদের দুর্দশা লাঘব করতে সক্ষম হচ্ছেন না। একজন শিক্ষিত মুসলমানের কলম দিয়ে যখন এসব বালখিল্যতায় ভরা কথা বা লেখা বেরিয়ে আসে, তখন পাঠকের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি বৈকি। কারণ এরা আবার নিজেদের একই সাথে 'আধুনিক' এবং 'পাক্কা

মুসলিম' লেবাসে ঢাকতে পারজ্গাম। কেউ কেউ ভাবেন, ঐসব লেখা মুসলমানদের সামনে এগোনোর পথে অনুপ্রাণিত করবে। কিন্তু আসলে কি তাই? জবাবে বলব, জ্বী-না। বাস্তবতা বড়ই রূঢ়। কোরানে যদি বিজ্ঞানের ব্যাপারে এতই ইঙ্গিত থেকে থাকত, তাহলে প্রশ্ন আসে পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মুসলমান হলেও বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে মুসলমান বিজ্ঞানীদের সংখ্যা কেন এক-শতাংশেরও কম? কিংবা, কেন পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশে যত বিজ্ঞানী রয়েছে, অমুসলিম ইসরাইলের একা রয়েছে তার চাইতে দ্বিগুন সংখ্যক বিজ্ঞানী?[1] তবে অর্বাচীন শ্রেণীর যেসব লেখকদের কথা বলছি অর্থাৎ যারা কিনা ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খুঁজে পান, তাদের মধ্যে সবাই যে কেবল মুসলমান, তা নয়। খ্রিষ্টানদের মধ্যেও একদল মূর্খ রয়েছে যারা একইরকম ভাবে বাইবেলে বিজ্ঞানের সূত্র সন্ধান করে বেড়ায়। ঠিক তেমনি, হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে তথাকথিত 'বেদিক সাইনস'-এর একদল প্রবক্তা। গত বিজেপি সরকারের আমলে বেদকে বিজ্ঞান শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে পুরো ভারতে এরা রীতিমত ঝড় তুলেছিল। এদের অনেকে এখনও সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আমি এই লেখায় মূলত 'কোরানে বিজ্ঞান' খোঁজার বিষয়টির অন্তঃসারশূন্য এবং যুক্তিহীনতার দিকেই মনোনিবেশ করব। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খোঁজার বিষয়ে ইন্টারনেটে সার্চ করলে প্রচুর লেখা পাওয়া যাবে। আমাদের 'মুক্তমনা' হিউম্যানিস্ট ফোরামেও এই বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক লেখা রয়েছে (উৎসাহীরা ইন্টারনেটে এই ঠিকানায় ব্রাউজ করতে পারেন ঃ www.mukto-mona.com)|

দুই

কোরানে কি সত্যি বিজ্ঞান লুকায়িত?

মনে মনে চিন্তা করছিলাম ব্যাপারটি নিয়ে। এমনটি কেন হয়, বিজ্ঞানীরা যখন কোন কিছু আবিষ্কার করে ফেলেন, কেবল তখনি কতিপয় অন্ধ মুসলমান, খ্রিস্টান ও হিন্দু মূর্খরা এটি তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে আছে বলে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, কিন্তু উলটোটি কখনোই দেখা যায় না, অর্থাৎ কোরান-বেদ-বাইবেলের তথাকথিত লুক্কায়িত সূত্র ধরে কেউ আজ পর্যন্ত একটিও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে পারেনি? আমাকে কেউ কি মাত্র একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইনস জার্নাল (যেমন- Science, Nature, etc)এর নাম বলতে পারবেন যেখানে বিজ্ঞানী তাঁর রেফারেনসের তালিকায় কোরান, বেদ, বাইবেলকে উল্লেখ করেছেন? (আমি গবেষণাধর্মী বিজ্ঞান জার্নালের কথা বলছি; 'বাইবেল-কোরান ও বিজ্ঞান' বা 'মহাগ্রন্থ কোরান ও বিজ্ঞান' জাতীয় স্থূল কোন গ্রন্থের কথা বলছি না।) উত্তর খোঁজতে গিয়ে 'এ মাদার ইন ম্যানভিল' গল্পের কথা মনে পড়ল। আমার কাছে ব্যাপারটা বেশ মজার বলে মনে হল। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, সেসব মুমিন-মুসলমান লেখক ক্বোরাণে বিজ্ঞান আছে বলে চেঁচামেচি করেন, তাঁদের সাথে উপরে উল্লিখিত গল্পের মূল চরিত্র জেরীর মননের অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে, অন্তত মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে। আপন অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বিনয়ী, প্রত্যয়ী এবং বুদ্ধিদীপ্ত হওয়া সত্ত্বেও জেরী যেমন কল্পনায় একজন মাকে সৃষ্টি করেছে-যিনি সন্তানকে ভালবাসেন, উপহারসহ দেখতে আসেন, তার সাথে সময় কাটান; ঠিক তেমনি কতিপয় মুসলমান লেখক-লেখিকা আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে আপন 'উম্মাহ'র পরিত্রাণের উপায় হিসেবে একের পর এক সৃষ্টি করে চলেছেন, কোরানে বিজ্ঞানের অস্তিত্বের গল্প। এই প্রবণতা একজন মানুষের মধ্যে তখনই ততো বেশি দেখতে পাবেন, তার স্বীয় অস্তিত্ব ও পরিচয়ের সংকট যখন যত বেশি হবে। উপরের গল্পে লেখিকার মাতৃসম স্নেহ, ভালবাসা জেরীকে কল্পনায় মা আবিষ্কারের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অমুসলিমদের বিশাল কর্তৃত্ব কতিপয় মুসলমান লেখক-লেখিকাদের ঠেলে দিচ্ছে কোরানে বিজ্ঞান খোঁজার দিকে। এই শ্রেণীর কিছু শিক্ষিত মুসলমানদের ভয়াবহ অজ্ঞতার কিছু বাস্তব উদাহরণ দেয়া যাক।

মুসলিম আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের অনেকে আমাকে নিয়ে আক্ষেপ করেন। জানতে চান, ধার্মিক মুসলমান পরিবারে জন্ম নিয়েও আমি কেন ধর্মে বিশ্বাস করি না। কেউ কেউ রেফারেন্স দিয়ে আমাকে ইম্প্রেস করার চেষ্টা করেন। যেমন-আরে ভাই, এত বই পড়েন অথচ এটাও জানে না, স্বয়ং আমেরিকার একজন মনীষী (?) পর্যন্ত গবেষণা করে রায় দিয়েছেন, মহানবি মুহম্মদ (সঃ) হচ্ছেন সর্বকালের (!) সর্বশ্রেষ্ঠ (!) মহামানুষ (!)। বিশেষণের ভুল প্রয়োগ দেখে আমি অবাক হই। বুঝতে পারি, অজ্ঞতার চেয়ে ভয়াবহ মানবিক অসুখ ধরনীর বুকে খুব কমই আছে। কারণ আমেরিকার সেই তথাকথিত 'মনীষী'র বইটির সরাসরি ইংরেজি ভার্সন আমি পড়েছি আর এঁদের বেশির ভাগই পড়েছেন এর অসম্পূর্ণ এবং ভুল বাংলা অনুবাদ (যা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বাজারে ছাড়া হয়েছে)। বইটি লেখেছেন মাইকেল এইচ. হার্ট (Michael H. Hart) নামের আমেরিকান একজন সাংবাদিক। বইটির তিনি নাম দিয়েছেন The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History। মাইকেল হার্ট নিজেই বইটির ভূমিকায় (যা অবৈধ বাংলা ভার্সনে অনুপস্থিত) পরিষ্কার করে উল্লেখ করেছেন, তিনি যা করতে চেষ্টা করেছেন, তা হচ্ছে ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী (The

most influential) লোকজনের একটি তালিকা তৈরি করতে, যার সাথে যে কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন এবং যা কোনো ক্রমেই 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ' বা The greatest human beings এর তালিকা নয়। যেমন- বইটিতে ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাববিস্তারকারী মানুষ হিসেবে সর্বপ্রথমে যেমনি মহানবি হযরত মুহম্মদ (স.)'কে স্থান দেয়া হয়েছে, তেমনি একই তালিকায় ৩৯নং-এ আছেন স্বয়ং হিটলার! অন্যান্য র‍্যংকিং-এ এসেছে স্টালিন, চেঙ্গিস খানদের নাম। মজার ব্যাপার, বইটির অবৈধ বাংলা সংস্করণের সংখ্যা একাধিক এবং টাইটেল বইয়ের নাম এসেছে বিকৃত আকারে, 'ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের তালিকা।' বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অনেকে বইটির কেবল বাংলা অনুবাদ পড়েছেন, আর ইংরেজিটা ছুঁয়ে দেখলেও খুব সম্ভবত The most influential এবং The greatest men in the human history' এর মধ্যে পার্থক্য বোঝার মত বুদ্ধিমত্তা এদের নেই! তারা অহেতুক রেফারেনসে আপ্লুত হন। কমবেশি একই রকম অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটায় অনেক শিক্ষিত মুসলমান যখন তারা মরিস বুকাইলি নামের সৌদী রাজপরিবারে চাকরী-করা একজন খ্রিস্টান ডাক্তারের (কোন বিজ্ঞানী নয়) একটি বইয়ের বিষয়বস্তুতে। বইটির নাম ঃ 'Bible, Quran and Science'(বাইবেল, কোরান এবং বিজ্ঞান)। মজার ব্যাপার বাইবেল, কোরান এবং বিজ্ঞানের মধ্যে কোরানকে চূড়ান্ত সত্য (?) বললেও মরিস বুকাইলি নিজে কিন্তু মুসলমান হননি! হওয়ার অবশ্য দরকারও নেই, কারণ জানা গেছে, কোরানকে আধুনিক পাঠক-পাঠিকার কাছে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে সৌদী শাসকরা বুকাইলিকে এই দায়িত্ব দিয়েছিল যে তিনি যেন একটি ইম্প্রেসিভ বই লিখে দেন। বিনিময়ে বুকাইলি পেয়েছেন বিরাট অঙ্কের পেট্রোডলার!!

তিন

একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নমুনা

বিজ্ঞান কার্য-কারণ(cause and effect) নীতি, অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সলিড গবেষণার ভিত্তিতে এগোয়, কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মূল্য নেই এখানে। আর ধর্মগ্রন্থের পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে অগাধ এবং প্রশ্নহীন বিশ্বাস। তেলে জলে কি আর মেশে? বিজ্ঞানীদের এক-একটি আবিষ্কার প্রকৃত অর্থে বহু বছরের নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন, মৌলিক গবেষণা এবং পূর্বসূরিদের একই বিষয়ে রেখে যাওয়া তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এখানে অলৌকিক গ্রন্থাবলির কোন স্থান নেই। আর তা বলা মানে, একজন বিজ্ঞানীর কৃতিত্বকে খাটো করা। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছি, ডি-এন-এ (DNA)আবিষ্কারের এর কথা। ডি-এন-এ অণুর পুরো নাম ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড। একে বলা হয় 'জীব দেহের প্রধান অণু' (The master molecule of life)। কেউ কেউ আদর করে ডি-এন-এ'কে ডাকেন 'প্রচারমাধ্যমের প্রেয়সী' (The darling of the media)। যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র/ছাত্রী না, তাঁরাও জিন থেরাপি, ক্লোনিং, মানব জিনোম প্রকল্প (Human Genome Project) ইত্যাদির নাম শুনে থাকবেন। এ সবগুলি কাজ ও গবেষণার মূল টার্গেট বা অস্ত্র হচ্ছে ডি-এন-এ (যার সাথে জিনের পার্থক্য হচ্ছে, বিশাল দৈর্ঘ্যের একেকটি ডি-এন-এ অণুতে রয়েছে অনেকগুলি আলাদা আলাদা অংশ, যা জিন (Gene) বলে পরিচিত)। এই ডি-এন-এ'র উপাদান ও গঠন আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানীদের সময় লেগেছে প্রায় একশ' বছর। যদিও ১৯৫৩ সালের জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক-এর ডাবল হেলিক্স মডেল ডি-এন-এ আবিষ্কারের ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বায়োলজি বা মলিকুলার বায়োলজির যে কোনো ছাত্র/গবেষক মাত্রই জানেন-পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণের সূত্র ছাড়া ১৯৫৩ সালের যুগান্তকারী ঘটনাটি সম্ভব ছিল না। আমি নিচে ডি-এন-এ আবিষ্কারের ক্রোনোলজিকাল সালগুলো উল্লেখ করছি- (সূত্র : nature, human genome issue)

- ১৮৬৯ সাল-সর্বপ্রথম জীব কোষ থেকে ডি-এন-এ পৃথক করা হয়।
- ১৮৭৯ সাল- মাইটোসিস কোষ বিভাজন পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- ১৯০০ সাল- জোহান ম্যান্ডেলের মটরশুঁটি বিষয়ক গবেষণার সন্ধান লাভ।
- ১৯০২ সাল-বংশগতি (Hereditar) বিষয়ে:ক্রোমোজোম তত্ত্বের ধারণার উদ্ভব।
- ১৯০৯ সাল- সর্বপ্রথম 'জিন' শব্দটি চালু হয় (এটি কোরানে বর্ণিত কোন 'জিন' নয়-লেখক)।
- ১৯১১ সাল- ফ্রুট ফ্লাই (Drosophila melanggaster) নিয়ে গবেষণা ক্রোমোজোম তত্ত্বের ধারণাকে শক্তিশালী করে।
- ১৯৪১ সাল-এক জিন এক এনজাইম তত্ত্বের ধারণা।
- ১৯৪৩ সাল-এক্সরে ডিফ্রেকশন (Xray diffraction) টেকনিকের প্রয়োগ করে ডি-এন-এর উপর গবেষণা করা হয়।

- ১৯৪৪ সাল-ডি-এন-এ ট্রান্সফরমেশন (Transformation) নীতির আবিষ্কার ।
- ১৯৫২ সাল-জিন যে আসলে ডি-এন-এ দিয়ে তৈরি, তা জানা যায় ।
- ১৯৫৩ সাল-জেমস ওয়াটসন, ফ্রান্সিস ক্রিক এবং উইলকিনস ডাবল হেলিক্স মডেল-এর মাধ্যমে ডি-এন-এ'র গঠন ও উপাদান ব্যাখ্যা করেন (সেসময় ওয়াটসনের বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর-লেখক) । ১৯৬৩ সালে সে জন্য তাঁদেরকে নোবেল পুরষ্কার দেয়া হয় ।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, ওপরের উদাহরণ দ্বারা আশা করি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, কোরান-বেদ-বাইবেলের সাথে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সামঞ্জস্য খোঁজা একধরণের অজ্ঞতা ও আহাম্মকি বৈ অন্য কিছু নয় । অথচ কেউ কেউ তাই করছেন । আর এ হীন কাজে তাদের সঙ্গী হচ্ছেন স্বার্থান্বেষী, লোভী এবং নামসর্বস্ব প্রচারপ্রিয় বিজ্ঞানী । যেমন-বাংলাদেশে ড. শমসের আলী "Scientific Indications in The Holy Quran" নামক বইটির তৃতীয় কভার পেজে কোরানের একটি আয়াত উল্লেখ করে তার সাথে বড় করে ডি-এন-এ অণুর ছবি জুড়ে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে, কোরানে ডি-এন-এ ব্যাপারে পর্যন্ত ইঙ্গিত রয়েছে । আয়াতটি এ রকম- "*এবং তোমাদের এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের গঠন-প্রকৃতিতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে সংবাদ*"(৪৫ঃ৪)

বলুন তো, এর সাথে ডি-এন-এ অণুর সম্পর্কটা কোথায়? এই মূর্খতা (নাকি, শঠতা) শেষ হবে কবে? এবার ভ্রুণতত্ত্বের সাথে ক্বোরাণের তথাকথিত মিলের ব্যাপারে একটি উদাহরণ দিচ্ছি ।

ভ্রুণতত্ত্ব (Embroyology) কি ক্বোরাণ থেকে এসেছে?

ক্বোরাণের বহু জায়গায় বলা হয়েছে, জমাট রক্ত থেকে মানুষের সৃষ্টি করা হয়েছে (২৩ঃ১৪; ৭৫ঃ৩৮; ৯৬; ২); যার সাথে বিজ্ঞানের অমিল ছাড়া কোনো মিল নেই । 'জমাট রক্ত' প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে বার বার কেন কোরানে আসল? এ রকম প্রশ্ন মনে আসতেই পারে । এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের একটুখানি দৃষ্টি দিতে হবে হজরত মুহম্মদের পূর্ববর্তী সমাজ ও ইতিহাসের দিকে । মুহম্মদের জন্ম (৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের জন্মের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪) প্রায় একহাজার বছর পরে । দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান তখনও (এমনকি এর পরেও) এরিস্টটলের চিন্তা-চেতনার মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছিল । স্বাভাবিক কারণেই এরিস্টটলীয় এসব ধারণা কম বেশি মুহম্মদকেও প্রভাবিত করেছিল । এক্ষেত্রে মুহম্মদের নিরক্ষরতা বড় কোন বাঁধা হওয়ার কথা নয় । যিশু, গৌতম বুদ্ধও নিরক্ষর ছিলেন । জমাট বাঁধা রক্ত (আলাক্বা, আরবীতে) থেকে জন্মের তত্ত্বটি এসেছে মূলত গ্রীকদের কাছ থেকে । এরিস্টটলকে জীববিজ্ঞানের জনক বলা হলেও জীব সম্পর্কিত তাঁর অনেক তত্ত্বই কালক্রমে ভুল প্রমাণিত হয়েছে । যেমন-মানব প্রজনন সম্পর্কে এরিস্টটল এই ভ্রান্তধারণাতে বিশ্বাস করতেন যে, যৌবনবতী মহিলার ঋতুস্রাব (menstrual blood) এর ওপর পুরুষের বীর্যের ক্রিয়ার ফলেই মাতৃগর্ভে শিশুর জন্ম হয়ে থাকে! জমাট-বাঁধা রক্ত থেকে জন্মের কোরানিক তত্ত্বে এরিস্টটলের এই ভ্রান্ত ধারণারই প্রতিফলণ ঘটেছে । সন্দেহ নেই, কোরানের এই ধারণাটি মারাত্মকভাবে ভুল । অথচ অনেক মুমিন এই সত্যকে মেনে নিবেন না কেবলমাত্র এই অন্ধবিশ্বাসের কারণে-'কোরান আল্লাহর বাণী, কাজেই ভুলত্রুটির ঊর্দ্ধে ।' মূলত ভ্রুনের পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরে এমন কোন পর্যায় নেই, যেখানে ভ্রুনকে জমাট রক্ত সদৃশ মনে হতে পারে, যখন মিসকারেজ (miscarriage) বা প্রাকৃতিক উপায়ে গর্ভপাত ঘটে । তর্কের খাতিরেও যদি মেনে নেই ভ্রুনটি জমাট রক্ত সদৃশ, তাহলেও ভুলে যাওয়া চলবে না-এটি কেবল মৃতভ্রুণের ক্ষেত্রে ঘটে অর্থাৎ যেটির আর পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে রূপান্তরিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই ।

জমাট রক্ত আসলে কী, সে সম্পর্কে প্রাণ রাসায়নিক (Biochemical) ব্যাখ্যাটা এখানে জেনে নেয়া ভাল, যাতে তথাকথিত ধর্মীয়-বিজ্ঞানের সমর্থকরা মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা বারবার আমাদের বিভ্রান্ত করার সুযোগ না পান । আঘাত বা দুর্ঘটনার ফলে রক্তক্ষরণ ঘটলে শরীরে স্বাভাবিক নিয়মেই ক্ষত বা আঘাতের স্থানে রক্ত জমাট বাঁধে । কৈশিক রক্তনালীর (capillary blood vessels) চাইতে বড় যে কোন রক্তনালী থেকে রক্তক্ষরণ ঘটলে জখম বা আঘাতের স্থানে রক্ত জমাট বাঁধে যাতে অতিরিক্ত ক্ষরণ আর না ঘটতে পারে । এ ক্ষেত্রে অনুচক্রিকা বা প্লেটলেট (তিন প্রকার রক্তকোষের একটি) এর ভূমিকা সর্বপ্রধান এবং সর্বপ্রথম । যখন শরীরে কোথাও কোন জখম বা আঘাত ঘটে, স্বাভাবিক অনুচক্রিকাগুলি তখন সক্রিয় অনুচক্রিকায় রূপান্তরিত হয় । এ গুলির তখন আকৃতির পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং এরা আঠালো হয়ে রক্তনালীর দেয়ালে জমা হয়ে প্লাগ(Plug) তৈরী করে । এই সক্রিয় অনুচক্রিকাগুলি থেকে একই সময়ে রক্তপ্লাজমায় বিশেষ এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ ঘটে থাকে । অনেকগুলি জটিল প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে ফাইব্রিনোজেন তখন ফ্রাইব্রিনে পরিণত হয় । ফ্রাইব্রিন হচ্ছে এক ধরণের অদ্রবণীয় প্রোটিন যা ফাইব্রিল নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুতা জাতীয় বস্তুর সমন্বয়ে জটিল জালিকার সৃষ্টি করে । রক্তকোষ এবং প্লাজমা (উভয়ের সমন্বয়েই রক্ত গঠিত) তখন

ফাইব্রিলের এই জালে আটকা পড়ে গিয়ে ক্লট বা জমাট রক্তের সৃষ্টি করে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), মুসলিম জ্যোতিবির্জ্ঞানী এবং কোরান

গ্রহ-নক্ষত্র এবং জ্যোতিষ্কমন্ডলী সম্পর্কে 'আল-ক্বোরাণের' ব্যাখ্যা একটু পর্যালোচনা করা যাক; কেননা ভ্রুণবিদ্যার মত এটিও 'ধর্মীয়-বিজ্ঞানী' এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক মুমিন বান্দাদের আরেকটি অতি প্রিয় বিষয়। সন্দেহ নেই, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) অনেক মুসলিম-মনীষীদের মৌলিক গবেষণা এবং অধ্যয়নের নিকট প্রভূতভাবে ঋণী। উদাহরণস্বরূপ আল-সুফী, আল-বিরুণি, আল-জারকালি প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নাম করা যায়। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, এসব মনীষীরা কোরান বা অন্য কোন ধর্মীয়গ্রন্থের সূত্র ধরে কিছুই আবিষ্কার করেননি। কেননা ক্লাসিক্যাল ইসলাম বা স্বর্ণযুগে (ঞযব এড়ষফবহ অমব ড়ভ ওংষধস) মুসলমান মনীষীরা যতটা না ছিলেন আচারসর্বস্ব মুসলমান, তার চাইতে অধিক তাঁদের পরিচিত ছিল 'যুক্তিবাদী' মনীষী হিসেবে। এঁদের সম্পর্কে পাকিস্তানের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানী এবং কায়েদে-এ আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পারভেজ হুডবয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য[2] : ".... ইসলামের স্বর্ণযুগে বিজ্ঞান অগ্রগতি লাভ করেছিল কারণ-ইসলামের অভ্যন্তরে তখন ছিলেন মুতাজিলা নামধারী শক্তিশালী যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের ধারক একদল চিন্তাবিদ। "সবকিছুই পূর্ব-নির্ধারিত এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ব্যতিত মানুষের অন্য কোন উপায় নেই"- নিয়তিবাদীদেও এ মতবাদের তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করে মুতাজিলারা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মুতাজিলারা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতায় ছিলেন, জ্ঞান তখন সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে গোঁড়া ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আল-গাজ্জালীর নেতৃত্বে ইসলামী রক্ষণশীলতার পুনরার্বিভাব ঘটে। আল-গাজ্জালী যুক্তির স্থলে দৈববাণী এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির স্থলে নিয়তিকে তুলে ধরেন। কার্য এবং ক্রিয়ার (cause and effect) সম্পর্ককে তিনি অস্বীকার করেন এই বলে যে, মানুষের ভবিষ্যৎ জানার শক্তি নেই, কেবল সৃষ্টিকর্তা এ বিষয়ে অবগত। গণিতশাস্ত্রকে আল-গাজালি 'ইসলাম বিরোধী' এবং 'মানবমনের জন্য ক্ষতিকারক' বলে মন্তব্য করেন। গোঁড়ামির জালে ইসলামের সমৃদ্ধি আটকা পড়ে যায়। মহামতি খলিফা আল-মামুন এবং হারুন-আল-রশিদ এর শাসনামলে রাজদরবারে মুসলিম, খ্রিস্টান এবং ইহুদী মনীষীদের একত্রে জড়ো হয়ে জ্ঞান-চর্চা এবং মত-বিনিময় করার যে প্রবণতা বহাল ছিল, তা পরবর্তীকালে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বে সহিষ্ণুতা, মেধা এবং বিজ্ঞানের মৃত্যু ঘটে। যুক্তিবাদী ধারার সর্বশেষ মুসলিম মনীষী হচ্ছেন চতুর্দশ শতাব্দীর আবদাল রাহমান ইবনে খালদুন।"

ক্ল্যাসিক্যাল ইসলাম যুগের অনেক মুসলমান মনীষীর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ কোরানের অনেক আয়াতকে 'অযৌক্তিক' এবং 'অবৈজ্ঞানিক' প্রমাণ করেছে। যেমন: কোরানের বর্ণনা অনুযায়ী, সূর্য অস্তমিত হয় একটি 'পঙ্কিল জলাশয়ে' বা muddy spring- এ (১৮:৮৬), তেমনি উদিত হয় একটি বিশেষ স্থান থেকে (১৮:৯০)। আমরা জানি, খালি চোখে সূর্য পূর্বাকাশে উদিত হয় এবং পশ্চিমাকাশে অস্ত যায় বলে মনে হলেও বিজ্ঞানের বিচারে তা আসলে সত্য নয় কেননা মহাশূন্যে অবস্থিত রয়েছে আমাদের সৌরজগতটি এবং সূর্য সেটির কেন্দ্র। পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন অবিরত ঘুরছে, ঠিক তেমনি এরা নিজেদের কক্ষপথে হচ্ছে আবর্তিত অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান লাটিমের বেলায় যেমনটি হয়। প্রায় ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী নিজস্ব কক্ষপথে একবার ঘুরে। এই কারণে সৌর জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্যের সকল আলো একই সাথে এসে গোলাকার ও ঘূর্ণায়মান পৃথিবী গায়ে এসে পড়তে পারে না। যেখানে পড়ে, সেখানটায় হয় দিন; বাকি জায়গায় অন্ধকার অর্থাৎ রাত। কিন্তু কোরানে বর্ণিত গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কিত বক্তব্যের সাথে বিজ্ঞানের এসব তথ্যের কোনো মিল নেই। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। গ্রীক ধারণার বশবর্তী হয়ে সেসময় প্রায় সকলে অজ্ঞতাবশত বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীর আকার গোলাকৃতি নয়, বরং চ্যাপ্টা; এবং পৃথিবী হচ্ছে মহাবিশ্বের কেন্দ্র (একে বলা হয় এরিস্টটলের ভূকেন্দ্রিক মহাবিশ্ব সম্পর্কিত মতবাদ বা Geocentric theory of universe)। তবে মুসলিম গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ আল-বিরুনি সে সময়ও (মৃত্যু ১০৪৮ সাল) বিশ্বাস করতেন যে, ঘূর্ণনশীল মহাবিশ্বের আকৃতি হচ্ছে গোল এবং মোটেও চ্যাপ্টা নয়। তাই বিজ্ঞানী বলতে হলে আল-বিরুণিকে বলা উচিৎ, কোনো পয়গম্বরকে নয়।

উপরের তথ্যগুলি দ্বারা এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা হয় যে, কোরান আসলে বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, ধর্মীয় গ্রন্থই (কেউ কেউ আবার দাবি করেন এটি আসলে মানুষেরই তৈরি একটি গ্রন্থ)। তাদের যুক্তি, তা না হলে মহাজ্ঞানী আল্লাহ কী করে সক্রেটিসের ভ্রান্তমতবাদগুলি পবিত্র আল-কোরানের পাতায় নিয়ে আসলেন? কোরানে এরকম অবৈজ্ঞানিক এবং অসামঞ্জস্যে ভর্তি বর্ণনার আরও কিছু উদাহরণ রয়েছে। কোরানের একটি আয়াত (২:২৯) অনুযায়ী, আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বেহেস্ত বা স্বর্গ সৃষ্টিতে মনোযোগ দিয়েছেন। আবার একই ক্বোরাণের অন্য স্থানে (৭৯:২৭-৩০) বলা হয়েছে, প্রথমে স্বর্গ বা বেহেস্ত তৈরীর কাজে আল্লাহ হাত দেন। অতঃপর দিন-রাত এবং সবশেষে পৃথিবী। আরেক জায়গায় বেহেস্ত এবং পৃথিবী তৈরির মোট সময় সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ ভুল করেফেলেছেন! যেমন : কোরানের কিছু কিছু আয়াত (৭:৫৪, ১০:৩, ২৫:২৯) অনুযায়ী আল্লাহ সর্বমোট ছয় দিনে বেহেস্ত ও পৃথিবী বানিয়েছেন; কিন্তু একই

ক্বোরাণের ৪১: ৯ আয়াত অনুযায়ী, আল্লাহ দুই দিনে পৃথিবী তৈরি করেছেন এবং সেখানে প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরিতে সময় লেগেছে আরও চারদিন (আয়াত ৪১:১০)। সবশেষে বেহেস্ত ও পৃথিবী সৃষ্টিতে মোট ব্যয়িত সময় হচ্ছে (২+৪+২) সর্বমোট ৮ দিন। তাহলে বেহেস্ত ও পৃথিবী সৃষ্টিতে সর্বমোট ব্যয়িত সময়ের ক্ষেত্রে মহাসত্য গ্রন্থ আল-কোরানের কোন বিবরণটি আসলে সত্য? ছয় (৬) দিন, নাকি আট (৮) দিন?

চার

বেদ চার-পাঁচ হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে আছে, কোরানের বয়সও দেড়হাজার বছরের কাছাকাছি; সেই তুলনায় আধুনিক বিজ্ঞানের বয়স মাত্র কয়েকশ বছর। অথচ দেখুন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, টেলিভিশন, রেল-কার উড়োজাহাজ, কম্প্যুটার-সবই কিন্তু গত দু'তিনশ বছরেই আবিস্কৃত হয়েছে। কেন আমাদের এতো 'মহাবিজ্ঞানী' পয়গম্বররা এগুলির একটিও আবিষ্কার করতে পারেননি? চিন্তা করে দেখুন, সামান্য একটা মোটরযান সে সময় থাকলে সংবাদবাহককে উটের পৃষ্ঠে চড়ে কষ্ট করে রোদ-বৃষ্টি পোহায়ে নবির সংবাদ নিয়ে এখানে-সেখানে যেতে হত না। রিমোর্ট কন্ট্রোলড ফাইটার প্লেন বা মিসাইল থাকলে ঘর থেকেই শত্রু নাশ করা যেত, অকারণে সাহাবিরা মারা যেতেন না; কেউ নিজের দন্তগুলিও খোয়াতেন না শত্রুর পাথরের আঘাতে! তথাপি, বিশেষ বাহনে চড়ে সাত আসমানের ওপরে বেহেস্ত-দোযখ দেখার কাহিনী শুনে আবেগে অনেকের চোখে জল চলে আসে, কিন্তু মস্তিষ্কে কোনো প্রশ্ন আসে না! কাজেই কার্য-কারণ (cause and effect) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে কোরাণ- বেদ-বাইবেলকে না মেলানোই উত্তম।

কোনটি বিজ্ঞান আর কোনটি ভূঁয়া বিজ্ঞান?

এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও অনেক মুসলিম মনে করেন, আমাদের নবি সাধারণ রক্তমাংসের কোন মানুষ ছিলেন না, ছিলেন নূরের তৈরি (এই কারণে বাংলাদেশে একবার কেউকেউ দাবি তুলেছিল, হাইস্কুলের বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলী লিখিত 'মানুষ মুহম্মদ' প্রবন্ধটি নিষিদ্ধ করার জন্য; যদিও লেখাটি নবি মুহম্মদের সম্পূর্ণ পক্ষে ছিল), নবীর আঙুলের ইশারায় চাঁদ দু' টুকরো হয়ে গিয়েছিল। দেশে তো বটেই, এমনকি প্রবাসেও বাঙালী মুসলিমরা এরকম বয়ান শোনার জন্য অল্পশিক্ষিত মোল্লাদের হাজার হাজার পাউন্ড-ডলার খরচ করে দেশ থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসেন। সম্প্রতি আমরা জেনেছি, কেবল সৌরজগতের একা (মিলিয়ন মিলিয়ন সৌরজগৎ নিয়ে তৈরি এক-একটি গ্যালাক্সী আর মহাবিশ্বে এ রকম বহু বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে। আমাদের সৌরজগত মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে অবস্থিত) রয়েছে কমপক্ষে ২১টি উপগ্রহ বা চাঁদ (সূত্রঃ ন্যাশনাল জিওগ্রাফী)। নিশ্চয় সেসময় এই ২১টি চাঁদের খবর জানা থাকলে, আজ হয়তোবা আমরা শুনতাম কোনো মহাপুরুষের আঙুলের ইশারায় ২১টি চাঁদ দু' টুকরো হয়ে গিয়েছিল! তখন নিশ্চয় কারো-কারো সারাজীবন চোখের জল ফেলতে হত ভাবাবেগের ঠেলায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোন বিষয়টি বিজ্ঞান আর কোন বিষয়টি বিজ্ঞান নয়-এ ব্যাপারটি একজন সাধারণ মানুষ বুঝবেন কী করে? বিষয়টি সুরাহার জন্য বিশ্বজনীন বিজ্ঞান গবেষণার অনেকগুলি নীতিমালা (criteria) চালু আছে। এদের একটি, যাকে ইংরেজিতে replicability বলা হয়, বাংলা হচ্ছে- গবেষণার ফলাফলের অভিন্নতা। ব্যাপারটি হাইপোথেটিক্যালি একটু ব্যাখ্যা করা যাক। ধরুন, কেউ একজন দাবি করে বসলেন, তিনি ক্যান্সার বা এইডস নিরাময়ের একটি ওষুধ পেয়ে গেছেন এবং সেটি ১০০% কার্যকরী। এখন লোকটির সেই দাবি কি একজন বিজ্ঞানী মেনে নেবেন, নাকি স্রেফ পাগলামি বলে বাতিল করে দিবেন? এই ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণা ছাড়া কোন মন্তব্যই করার অধিকার রাখেন না। কিন্তু প্রশ্ন হল, পরীক্ষা করতে হলে তাঁকে কিভাবে এগুতে হবে? এই ক্ষেত্রে যিনি ওষুধটি আবিষ্কার করেছেন, তাঁকে প্রয়োজনীয় তথ্যের যোগান দিতে হবে। তবে গোপনে তা করতে হবে না। যেকোন স্ট্যান্ডার্ড সাইন্স জার্নালে তিনি ওষুধটি আবিষ্কারের পদ্ধতি এবং কার্যকারিতা বিষয়ে যেসব রোগীদের ওপর গবেষণা চালিয়েছেন, সেসবের সংশ্লিষ্ট বিবরণ এবং উপাত্ত (statistical data) ছাপাবেন। এখন অন্য আরেকজন বিজ্ঞানী (পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের) একই পদ্ধতি এবং পরিবেশে গবেষণা করে যদি ওষুধটির কার্যকারিতার বিষয়ে একইরকম বা প্রায় কাছাকাছি রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন, কেবল তখনই একজন বিজ্ঞানী বলতে পারেন ক্যান্সার বা এইডসের ওষুধটি আসলেই একটি নতুন আবিষ্কার এবং ১০০% কার্যকরী। এরই নাম replicability। কথিত 'মিরাজ' এর কাহিনী, বা যীশুর 'পুনুরুত্থান' এর কাহিনী বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত নয়, কারণ এটি কখনই কোন বিজ্ঞানী কর্তৃক তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক- কোন ভাবেই প্রদর্শন বা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। একই রকম কথা বলা যায়-'স্বপ্নে পাওয়া গাছ দিয়ে চিকিৎসা' জাতীয় পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত পীর-তান্ত্রিক-বাবাদের প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন সম্পর্কে। নর্থ আমেরিকার বিখ্যাত ম্যাজিসিয়ান (যিনি 'মুক্তমনা'র একজন লেখকও বটে) জেমস র‍্যান্ডির এ বিষয়ে একটি মজার চ্যালেঞ্জ আছে। যেকেউ বিজ্ঞানের নীতিমালা মেনে নিয়ে

অলৌকিকত্ব বা সুপারন্যাচারাল বিষয়ে প্রমাণ দিতে পারলে নগদ এক মিলিয়ন ডলার পুরস্কার পাবেন।[3] আমাদের দেশের তথাকথিত 'পীর' এবং 'আধ্যাত্মিক সাধক-সাধিকারা' চাইলে র‍্যান্ডির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রবীর ঘোষও অনুরূপ চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছেন বহুদিন থেকে। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ম্যাজিশিয়ান জুয়েল আইচেরও এ ব্যাপারে একটি ঘোষণা আছে। ল্যাবরেটরিতে কেউ অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপারের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারলে তাকে একাধিক লক্ষ টাকা (রিয়েল ফিগারটা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না-লেখক) পুরস্কার দেয়া হবে। বাংলাদেশে হাজার-হাজার পীর-ফকির-তান্ত্রিকদের কেউই আজ অবধি জুয়েলের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন বলে আমার জানা নেই। অথচ প্রতিনিয়ত পত্রিকায় প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপণের মাধ্যমে হতাশাগ্রস্থ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন পাবলিকের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

প্রশ্ন আসতে পারে, বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষায় কি ভুল হতে পারে না? কিংবা, বিজ্ঞানের কথাই কি সর্বদা ধ্রুব সত্য বলে মানতে হবে? উত্তরে বলব: বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবশ্যই ভুল হতে পারে, অনেক সময় হয়ও; কিন্তু একজন বিজ্ঞানী বা তাঁর তত্ত্বকে যদি অন্য আরেকজন বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (পরীক্ষা-নিরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা) দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ভুল প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে প্রথম বিজ্ঞানীকে নতুন তথ্য উপাত্ত-ফলাফলের ভিত্তিতে তার থিওরী অবশ্যই পর্যলোচনা করতে হবে, তা তিনি প্রফেসর স্টিফেন হকিংনস বা ডঃ কদম আলী, যেই হোন না কেন। বিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্যটি যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদীদের বেশি আকৃষ্ট করে থাকে, তা হচ্ছে এই ব্যাপারটি। সে জন্যই বলেছি, বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত মতামতের মূল্য নেই। ধর্মগ্রন্থের সাথে বিজ্ঞানের এটিই মূল তফাৎ। কোরান অপরিবর্তনীয়, অলংঘনীয়; বিজ্ঞান তা নয়, কেননা পরিবর্তনশীলতা হচ্ছে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য আর সতত পরিবর্তনশীল সেই প্রকৃতির রহস্যের উন্মোচন হচ্ছে বিজ্ঞানের মহান লক্ষের একটি।

শেষ কথা

ধর্ম সম্পর্কীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং অতি-প্রাকৃতিক কাহিনী সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করলে অনেকে আমাকে প্রায়শই এই বলে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন, ভাই যার যার বিশ্বাস তাঁর কাছে। কেন খামোখা মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করে তাঁদের কষ্ট দেন? বলতে ইচ্ছা হয়, মানুষকে অহেতুক কষ্ট দিয়ে যাঁরা চিত্তে সুখ অনুভব করেন, তারা স্যাডিস্ট এবং আমি মোটেও তাদের একজন নই। তবে কেন আমি ক্বোরাণ এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে এতসব কথা লিখছি? এতে কি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে আঘাত লাগতে পারে না? প্রশ্ন আসতেই পারে। আর তার জবাবও রয়েছে।

মুসলমানরা সংখ্যায় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। মোটেও চাট্টিখানি কথা নয়। এক বিলিয়নের মত মুসলমানদের ঘরে শিশু-কিশোরদের সংখ্যা কত হতে পারে? নিশ্চয়ই তা সংখ্যার মাপে বিশাল এবং গুরুত্বপূর্ণ। এখন এই কয়েক শতকোটি কিশোরেরা কি করে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হবে যদি তাদের মাতা-পিতা, গুরুজনদের সকলেই বিশ্বাস করেন যে, আল-কোরানেই রয়েছে সকল বিজ্ঞান? তাঁরা কি জবাব দেবেন (বা দিচ্ছেন) যদি তাদের স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানের ক্লাশ এটেন্ড করে এসেই জিজ্ঞাস করে: আচ্ছা, আব্বু-আম্মু, বিজ্ঞানের কার্য-কারণ (cause and effect) নীতির সাথে ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আদম-হাওয়া-শয়তান, ফুঁক দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি কি মেলে? কিংবা, ঝড়-বৃষ্টিতো প্রাকৃতিক কারণে ঘটে থাকে, এর সাথে ফেরেস্তা মিকাইলের কি সম্পর্ক? আমার খুব জানতে ইচ্ছা হয়, মুসলমান বাবা-মায়েরা এসব প্রশ্নের উত্তরে কি বলেন তাদের সন্তানদের। তাঁরা কি বলেন, 'বিজ্ঞানের ক্লাশে যা শিখেছো সব মিথ্যে আর ধর্মগ্রন্থের বর্ণনাই সত্যি?' নাকি, 'বিজ্ঞান এবং ধর্মগ্রন্থ দুটোই সত্যি?' এই দুটো উত্তরই মিথ্যা। আমার বিশ্বাস, সকলে না হলেও মুসলমান মাতা-পিতার অন্তত কেউ কেউ সন্তানদের সামনে সত্য গোপন করাটাকে প্রশ্রয় দেন না এবং সরাসরি বলে দেন, 'কার্য-কারণ নীতি'র উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে ধর্মগ্রন্থের কোনো মিল নেই। মিল খোঁজার চেষ্টা করা বৃথা। এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয়।' যে সব মাতা-পিতা এই সত্যটি তাঁদের সন্তানদের কোন রাখ-ঢাক ছাড়াই বলার ক্ষমতা রাখেন, তাঁরা কেবল নিজেদের সন্তানদের সত্য, সুন্দর এবং বিজ্ঞানধর্মী মানসিকতা বিকাশের পথটিই সুগম করেন না; তাঁরা এ ক্ষেত্রে মানবতারও একটি উপকার করছেন। কেননা, আমরা সবাই জানি আগামীদিনের সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি আমরা আজই শুরু করতে পারি, তা হচ্ছে- আমাদের নতুন প্রজন্মকে সত্য, সুন্দর এবং বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা।

তথ্য তালিকা :

১ Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality by Pervez Hoodbhoy
২ Pervez Hoodbhoy, "Muslims and the West After September 11," Washington Post (2002).
৩. www.randi.org

যুক্তিবাদ : একটি দর্শন একটি আন্দোলন

মফিজুর রহমান রুন্নু

'যুক্তিবাদ' কথাটির উৎস দর্শন। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক রেনে দেকার্তের (১৫৯৬-১৬৫০) দর্শনকেই আধুনিক যুক্তিবাদের ভিত্তি বলা যায়। স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭), লাইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬) প্রমুখ ছিলেন যুক্তিবাদী দার্শনিক। পাশ্চাত্য দর্শনের এই 'যুক্তিবাদ' কথাটিকেও ইংরেজিতে `Rationalism' বলা হয়েছে। এই `Rationalism' শব্দটির বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'যুক্তিবাদ' বা 'বুদ্ধিবাদ'। তবে আমরা অর্থাৎ যুক্তিবাদী কর্মী সংগঠকগণ 'যুক্তিবাদ বলতে যেটা বুঝি সেটা আর আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের 'যুক্তিবাদ' কথাটির অর্থ এক নয়, বরং বিপরীত।

কোনো বিষয়ে আমরা যদি যথার্থভাবে জানতে না পারি তবে, সে বিষয় সম্পর্কে আমাদের যথার্থ জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। কোনো বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারলে অর্থাৎ শুধু বিশ্বাস নয়, সে বিশ্বাসের সমর্থনে যদি সাক্ষাৎপ্রমাণ বা শক্তিশালী যুক্তি না থাকে তবে সে বিষয়ে আমাদের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। ধারণা থেকে বা বিশ্বাস থেকে জ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞান মানে নিশ্চিতিবোধ। যে সব বিষয় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা চলে তাকে আমরা সত্য বা নিশ্চিত জ্ঞান বলে দাবী করতে পারি না। সত্যকে সন্ধান করা দর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ। আমরা কীভাবে সত্যে উপনীত হতে পারি বা সঠিক জ্ঞানলাভ করতে পারি সে পথ বা পদ্ধতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য দর্শনে প্রধানত চারটি ভিন্ন মতবাদের জন্ম হয়েছে :

১. যুক্তিবাদ বা বুদ্ধিবাদ (Rationalism)
২. প্রত্যক্ষবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism)
৩. বিচারবাদ (Critical Theory) ও
৪. দ্বান্দ্বিকবাদ (Dialectic Theory)

পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিবাদ বা বুদ্ধিবাদের মূলকথা হলো–আমাদের বুদ্ধি বা মস্তিস্কজাত যুক্তিবোধই সঠিক জ্ঞানলাভের সব থেকে নির্ভরযোগ্য। এ ক্ষেত্রে পঞ্চইন্দ্রিয়ের ভূমিকা গৌণ। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে জ্ঞানের পর্যায়েই ফেলতে চাননি। তাঁরা বলেন–ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের সর্বক্ষেত্রেই সঠিক তথ্য দেয়, এটা বলা যাবে না। বরং প্রায়শই সেগুলো আমাদের ভুল তথ্য দেয়। অনেক সময় আমাদের রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম হয়। সুতরাং সত্যে উপনীত হতে বা সঠিক জ্ঞান লাভের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হলো আমাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা যুক্তি। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বুদ্ধিবাদ বা যুক্তিবাদ ভাববাদী দর্শনের আওতাভূক্ত। ভাববাদী দার্শনিকগণ গুরুত্ব দেন মানুষের বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা স্বজ্ঞাকে। ভাববাদীদের মতে বিশ্বজগতের বাস্তব অস্তিত্বের থেকে বিশ্বাসযোগ্য হলো আমাদের বুদ্ধি বা চেতনা। বাস্তব বা দৃশ্যমান জগৎ মায়া, আমাদের চেতনাটাই প্রধান। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণও ভাববাদী ছিলেন, বস্তুবাদী নন। তাঁদের ঈশ্বর বা ধর্ম বিশ্বাসও ছিল গভীর।

সুতরাং পাশ্চাত্যের 'যুক্তিবাদ' আর আমাদের 'যুক্তিবাদ' স্পষ্টতই ভিন্ন, এটা আমাদের কাছে পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কয়েক দশক ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুক্তিবাদী সংগঠনগুলো ভিন্নধারার যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তা বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান নির্ভর যুক্তিবাদের ভিত্তিতেই। পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিবাদ ভাববাদেরই অংশ। আবার যাকে পাশ্চাত্য দর্শনে 'বিজ্ঞানবাদ' বলা হয় সেটার মধ্যেও বিজ্ঞান নেই, আছে ভাববাদ। আমরা জানি যুক্তিও নানা রকমের হতে পারে। সবাই নিজ যুক্তিকে অভ্রান্ত মনে করে। কোনো কোনো মাওলানাকেও নিজ নামের শেষে 'যুক্তিবাদী' কথাটি জুড়ে দিতে দেখা যায়।

আমাদের 'যুক্তিবাদ' স্পষ্টতই বস্তুবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছে এবং তা আধুনিক বিজ্ঞানকেই তার শক্তির উৎস বলে মনে করে। যুক্তিবাদীরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বস্তুবাদের উপরেই নির্ভর করে। তারা মনে করে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক–এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই বস্তুগত ধারণা লাভ করা যায়। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছাড়া সঠিক জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি চোখ-কান বুজে বস্তুজগতের সাথে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তার পক্ষে সত্যের সন্ধান পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যের 'প্রত্যক্ষবাদ' (Empiricism) সমর্থনকারী দার্শনিকগণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত ধারণাকেই জ্ঞানের উৎস বলে মনে করেন। জন্মের সময় মানুষের মন একেবারে অলিখিত সাদা কাগজের মতো থাকে, সেখানে ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলো একে একে ছাপ ফেলে। আমরাও এই প্রত্যক্ষবাদীদের মতোই মনে

করি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রাথমিকভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতিরূপে নিম্নতর স্তরে থাকে, পরে এটাই মস্তিস্ককে প্রভাবিত করে আমাদের সঠিক তথা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানলাভে সাহায্য করে। চোখ বুজে, ধ্যান করে বা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে জানা যায় না। আর সেভাবে কোনো কিছুকে ব্যাখ্যা করতে গেলেই ভুল হবে। যুক্তিবাদীরা বিশ্বজগৎকে 'মায়া' মনে করে না, তা বাস্তব অস্তিত্বশীল বলেই মানে। মানুষের আবির্ভাবের আগেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তু জগৎ আমাদের চেতনার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং আমাদের চেতনাই বস্তুজগতের ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বজগৎ আমাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ ভাবেই বিরাজ করে। এ বিশ্বজগৎকে জানা যায়, তার বিভিন্ন বিষয়কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োগের মাধ্যমে বোঝা যায় এবং তার বিধিনিয়ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়। এভাবেই আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রাথমিক জ্ঞান ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং যাচাই-এর মাধ্যমে বিজ্ঞানে উন্নীত হতে পারে। এ কারণে যুক্তিবাদীদের দার্শনিক ভিত্তি বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান। এ কারণেই যুক্তিবাদীরা সমস্ত অধ্যাত্মবাদ, অলৌকিকতা ও ভাববাদ প্রকৃত অলীক কল্পনাকে অস্বীকার করে। তারা তাদের সমস্ত সিদ্ধান্তে যুক্তিনিষ্ট অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক নির্মোহ জ্ঞানকে প্রাধান্য দেয়। বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে কোনো যুক্তিবাদের অস্তিত্ব নয়।

'যুক্তিবাদ' নতুন কোনো মতবাদ নয়, বা হঠাৎ গজিয়ে উঠা ভুঁইফোড় কোনো বিষয়ও নয়। প্রাচীন যুগ থেকেই চিন্তাশীল মানুষের চিন্তা চেতনায় বিভিন্ন সময়ে এর স্পূরণ ঘটেছে। মানুষ চিন্তাশীল জীব; যুক্তিবাদীতা তার চিন্তাধারার একটি স্বাভাবিক দিক। কোনো নির্দিষ্ট একজন মানুষ 'যুক্তিবাদে'র প্রবর্তক নন। আমরা প্রাচীন আইওনীয় দর্শন, চার্বাক, সাংখ্য, মীমাংসা, যোগ দেহাত্মবাদ, বাউলতত্ত্ব, মোতাজিলা ইত্যাদি মতবাদেও আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে বার বার 'যুক্তি'র আত্মপ্রকাশ দেখেছি। অবশ্য তার মাত্রা এবং বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে এটুকু বলা যায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আজকের আধুনিক যুক্তিবাদ তার রসদ সংগ্রহ করেছে। দর্শনের ক্ষেত্রে আজকের যুক্তিবাদ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ওপর এবং পদ্ধতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাজগৎ ও দর্শনে যুক্তিবাদী চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে অনেকবারই। আমরা সে ধারাবাহিকতার উত্তরসূরী। সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ছিল নাস্তিক্যবাদী। চার্বাক দার্শনিকরা আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক, শাস্ত্র ইত্যাদিকে অস্বীকার করেছিলেন। সাংখ্য দর্শনে বস্তুজগতের বিকাশ ও কার্য ব্যাখ্যায় 'স্বভাববাদ' অনুসরণ করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনে বলা হয় :

নাবস্তনো বস্তুসিদ্ধিঃ
(সাংখ্যকারিকা ১/৭৮)
অবস্তু থেকে বস্তুর, অভাব থেকে ভাবের
নিরাকার ব্রহ্ম থেকে সাকার জগতের
উৎপত্তি হতে পারে না।

ভারতীয় ন্যায় দর্শন যুক্তিতর্ক ও বিচারমূলক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায় দর্শনে প্রমাণকেই যথার্থ জ্ঞানের উৎস বলে মনে করা হয়। প্রত্যক্ষকেই 'প্রমাণ জ্যেষ্ঠ' বলা হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক কনাদ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বর বা কোনো পুরুষকে জগতের কারণ বলে উল্লেখ করেন নি। মীমাংসা দর্শনে মনে করা হয়–নানা বৈদিক দেবতারা শুধু কতকগুলো শব্দমাত্র, এগুলোর উপাসনা করা বৃথা এবং সুখ লাভ করার নামই স্বর্গ, যা এই মর্ত্যেই সম্ভব।

চার্বাক দার্শনিকরা বিশ্বজগৎ সৃষ্টির জন্য ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ–এই চতুর্ভূতের ভূমিকাকেই দায়ী বলে মনে করেন। দেহের বাইরে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং প্রত্যক্ষের বাইরে কোনো অলৌকিক শক্তিতে তারা বিশ্বাস করেন নি।

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও ঈশ্বর অস্বীকৃত হয়েছে। প্রাচীন বৌদ্ধপন্ডিতগণ যুক্তিকেই বিচারের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বলেন–'যুক্তিমদ্ বচনং গ্রাহ্যম'। অর্থাৎ কোনো বচন বা আপ্তবাক্যকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে যুক্তির দ্বারা যাচাই করে তবেই গ্রহণ করতে হবে। পাশ্চাত্যের পন্ডিত ওয়াল্টার রুবেন ছান্দোগ্য–উপনিষদে বর্ণিত উদ্দালক আরুনিকে ভারতের প্রথম বস্তুবাদী দার্শনিক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর দর্শনে গ্রীসের প্রথম দার্শনিক থ্যালেস-এর মতো বস্তুবাদ বা প্রাচীন বিজ্ঞানের প্রভাব ছিল।

বাউলের দেহাত্মবাদও বস্তুবাদী দর্শন প্রসূত। তারা মানুষকেই শ্রেষ্ঠ জীব বলে মানে। তাদের মতে এই মানব দেহেই সত্য, তা-ই পবিত্রতম। 'যা আছে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে, তা আছে এই দেহভান্ডে'। চৈতন্য বা আত্মা বলে যদি কিছু থেকে থাকে তা দেহের অভ্যন্তরেই থাকতে পারে, দেহের বাইরে কোনো আত্মা বা চৈতন্য নেই। তাই বাউল দেহতত্ত্ব বা কায়াসাধনার অনুরাগী। দেহস্থিত চৈতন্যরূপী আত্মাকে পাওয়ার সাধনায় সে ব্যাকুল হয়। পরকালে বাউলের আস্থা নেই, শাস্ত্রে-মন্ত্রে সে অনুগত নয়, অলৌকিকতায় তার বিশ্বাস নেই। প্রাচীন বাঙালি একদিন বলেছিলেন–

কিংতো দীবে কিংতো নিবেজ্জে

কিংতো তিথ–তপোবন জাই
মোক্খ কি লবভই পানী হ্নাই ।

অর্থাৎ–কী হবে তোর দীপে আর নৈবেদ্যে? মন্ত্রের সেবাতেই বা কী হবে তোর? তীর্থ-তপোবনই বা তোকে কী দেবে? পানিত্মোন করলেই কি মুক্তি মেলে?"

প্রত্যক্ষবাদী বাউলেরা ইহজাগতিকতায় বিশ্বাসী । যা অপ্রত্যক্ষ ও অপ্রমাণিত তা বাউলের বিশ্বাস উৎপাদন করেনি । তাই তারা বলে–

অদৃশ্য ভজনা করা
অন্ধকারে সর্প ধরা"
অথবা,
"যে দেখেছে বর্তমানে
অনুমান সে মানবে কেনে?

প্রাচীন বাঙালির ধর্মবিশ্বাসও ছিল ইহজাগতিক, সে ধর্মে পারলৌকিক জীবন কল্পনার দরকার হয়নি । সে নিজের পার্থিব ও বৈষয়িক প্রয়োজনেই নানা লৌকিক দেব-দেবী সৃষ্টি করে নিয়েছিল । স্মরণাতীত কাল থেকে বিদ্রোহী বাঙালি বহিরাগত ও আরোপিত ধর্মকে ওপরে ওপরে গ্রহণ করলেও মনে-প্রাণে সম্পূর্ণ মানেনি । সে আজও তার লৌকিক দেব-দেবীকে বিসর্জন দেয়নি । বাঙালি ছিল মূলত ইহজাগতিক আচারে অভ্যস্ত । এ কারণে বাঙালির চিন্তা-চেতনায় প্রচুর যুক্তিবাদী উপাদান পাওয়া যায় । সুতরাং আমরা এদেশীয় চিন্তাজগৎ থেকে যুক্তিবাদের অনেক উপাদান সংগ্রহ করতে পারি ।

বলা হয়ে থাকে–মানুষের সমগ্র জ্ঞানভান্ডারকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়–বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম । বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে দু'টি পায়ের উপর–একটি সুষ্ঠু যুক্তিবিচার, অপরটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা । দর্শন দাঁড়িয়ে আছে একটি পায়ের উপর–তা হলো সুষ্ঠু যুক্তিবিচার । কিন্তু ধর্মের দাঁড়িয়ে থাকার মতো কোনো পা নেই । ধর্মের ভিত্তি একটাই–তা হলো মানুষের বিশ্বাস । কিন্তু শুধু বিশ্বাস মানুষকে জ্ঞান দিতে পারে না । বরং তা সর্বক্ষণ বিভ্রান্ত করে । সমস্ত ধর্মে বিশ্বাস বা ঈমানের ওপর জোর দেওয়া হয় । বলা হয়–"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর" । রামকৃষ্ণ বলতেন–"তাঁর কাছে বলতে হয়–আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও । বিশ্বাস হয়ে গেলেই হলো । বিশ্বাসের চেয়ে আর কোনো জিনিস নাই ।"

যুক্তিবাদীরা সমস্ত অন্ধবিশ্বাস বর্জন করে, তারা বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলোর বিপরীতে মানবতা বা মনুষ্যত্বের ধর্মকে গ্রহণ করে । যুক্তিবাদীরা একারণেই জাত, বর্ণ, লিঙ্গ ও ধর্মভেদে বিশ্বজনীন মানবতাবাদকে ধারণ করতে পারে । প্রথাগত কোনো ধর্ম বিশ্বাস নয়, বরং যুক্তিবাদীদের নৈতিকতার উৎস তার জাগ্রত বিবেক এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ।

যুক্তিবাদীরা ইহজাগতিকতায় বিশ্বাসী । পারলৌকিক জীবনে তাদের আস্থা নেই । এ জীবনই সত্য, এ জীবনের বোঝাপড়া ও হিসেব-নিকেশ এ জীবনেই শেষ । পারলৌকিক পুরস্কার বা শাস্তির প্রলোভন বা ভয় তাকে বিচলিত করে না । তার লক্ষ্য এই বাস্তব দুনিয়াকেই বাসযোগ্য করে তোলা ।

যুক্তিবাদী মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক । বিজ্ঞানে তার আস্থা আছে । কারণ বিজ্ঞান না জেনে জানার ভান করে না । যুক্তিবাদী মানুষ সংস্কারমুক্ত, অনুসন্ধিৎসু; বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণকে গ্রহণ করে, সে ধর্মীয় আবেগ বা শাস্ত্রবাক্য অনুযায়ী নিজেকে চালনা করে না ।

যুক্তিবাদী মানুষ কুসংস্কারের অসারতাকে উন্মোচন করতে পারে । অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও আদিম বিশ্বাসপ্রসূত নানা কুসংস্কার সমাজে ছড়িয়ে আছে । গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ায় অনেক কুসংস্কার ধর্মের অন্তর্ভূক্ত হয়ে শাস্ত্রীয় গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, আবার অনেক কুসংস্কার ধর্মের গন্ডীকে বাইরে থেকে বেস্টন করে টিকে আছে । যে বিশ্বাসগুলো বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তি-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, মানুষের আদিম চিন্তাপ্রসূত এক নেতিবাচক উপাদানরূপে মানব সমাজে টিকে আছে সেগুলোকে কুসংস্কার বলা যেতে পারে । এটা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত, এমনকি প্রতারিত করে । যুক্তিবাদীরা সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ।

সাহসী না হলে যুক্তিবাদী হওয়া যায় না । কারণ তাকে প্রচলিত ধর্ম, চিন্তা-চেতনা ও অন্ধবিশ্বাস প্রসূত গড্ডালিকা প্রবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় । এ সমাজে যুক্তিবাদীরা সংখ্যালঘু হলেও নৈতিক শক্তি ও মনুষ্যত্বের ধারক হিসেবে তারা বড় মাপের মানুষ । তারা সংকীর্ণ জাত, সম্প্রদায় ও ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে আলোকিত মানুষ ।

আজকের পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে । মানুষ জয় করছে অজানাকে, উন্মোচন করছে পৌরাণিক অতিকথা ও কুসংস্কারের অন্ধকার যবনিকা, ছড়িয়ে পড়ছে সমুদ্রতল থেকে মহাকাশের অসীম দূরত্বে, ক্ষুদ্রতম পরমাণু থেকে বিশাল নক্ষত্রমন্ডল তার গবেষণার আওতায় । দৈত্য-দানো, দেবতা–অপদেবতা, ভূত-প্রেত ও ভক্তি-বিশ্বাসের দিন অবসিত । মানুষ আজ বিশ্বাসের (ঈমানের) গালিচায় আকাশ পথে ভ্রমণ নয়, বরং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আকাশযানে চড়ে ভ্রমণ করাতেই আস্থা রাখে । প্রার্থনা নয়, বরং পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়কেই তার সাফল্যের কারণ বলে মনে করে । অপদেবতা বা কারো

অভিশাপে রোগ-ব্যাধি হয় না, বরং তা ভাইরাস বা ব্যাকটোরিয়া কারণেই ঘটে। রক্ত-পাথরে কারো ভাগ্য ফেলে না, পানি পড়া বা তেল পড়াতেও রোগ নিরাময় হয় না।

আমাদের সমাজকে যদি এগিয়ে নিতে হয় তবে সমস্ত অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান ও ধর্মীয় বিশ্বাসপ্রসূত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্পকে রুখতে হবে, বিজ্ঞানভিত্তিক গণশিক্ষা ও এক বিরামহীন সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালাতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে আমরা এগিয়ে চলার গতি পাবো না।

আলোকবিন্দু

অরুণকান্তি দাশ

প্রোটাগোরাস বলেছিলেন "দেবতা আছেন বা নেই তা জানবার আমার কোন উপায় নেই। অতোটা জানবার পথে অনেক বাধা রয়েছে: কারণ একে তো প্রশ্নটাই ধোঁয়াটে ধরনের, তার ওপর আমাদের আয়ুও সীমিত।" মানুষের বিচারেই মানুষের মূল্য নির্ধারিত হতে হবে। আপন উপলব্ধিজাত সত্যই সত্য। মানুষের উপলব্ধিতে যা ধরা পড়েছে তারই শুধু অস্তিত্ব আছে। যা মানুষের আপন অনুভবে-উপলব্ধিতে ধরা পড়েনি তা অস্তিত্বহীন। অজ্ঞেয় অস্তিত্বহীন বস্তুকল্পনা বাতুলতামাত্র।

তারই সমসাময়িক ছিলেন হিপিয়াস। হিপিয়াসের মতে–জীবনকে সর্বোত্তম শিল্পরূপে গড়ে তোলাই মহত্তম আদর্শ। সে শিল্পে হবে সব শিল্পের অধিষ্ঠান। জগৎ কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষ। জগৎ ও জীবন একার্থক। এ ধরনের মতবাদের সূচনা ঘটে প্রাচীন গ্রীসে যাদের ধারক বাহকগনকে বলা হয় 'সফিস্ট' (Sophist)। এ মতবাদের মূল সত্য হলো বাস্তব যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে খুঁজে পেতে হবে জ্ঞানকে। যাকে চোখে দেখছি, যাকে ভোগ-উপভোগ করছি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এ জগৎ ও জীবন মিথ্যে হতে পারে না। স্তোকবাক্য বা প্রশ্নাতীত স্বতঃসিদ্ধ বিধান কোনো সমাজের নিয়ামক হলে তা হবে বৃত্তাবদ্ধ অচল সমাজ। চলন্ত জল স্বচ্ছ, আবদ্ধজল অস্বচ্ছ। চিন্তাহীন মস্তিস্ক জড়বৎ; সৃষ্টিশীল মস্তিস্ক মৃত অতীতাশ্রিত নয় কখনো।

'মানুষ' পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি। আবার বিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টির স্রষ্ঠা মানুষ। কালিক বিচারে আগে মহাবিশ্ব তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; তারপর পৃথিবী, তারপর মানুষ, তারপর ধর্ম এবং সবশেষে বিজ্ঞান। শ্রমলব্ধ মননশীল প্রত্যক্ষবাদই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে আছে বিরুদ্ধ প্রকৃতি। অজ্ঞেয় বিরুদ্ধ প্রকৃতিই মানব ভাবনার মূল প্রেরণা। প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ জয়ের ফলই বিজ্ঞান। আলোর পথে বাধা থাকে প্রচুর; কিন্তু অন্ধকারের পথে কোন বাধাই থাকে না। অন্ধকার ঠেলেই আলোকে অগ্রসর হতে হয়। অগ্রগতিতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানসিক ঊর্ধ্বতন। শ্রমলব্ধ মননশীল ভাবনা ভাবতে না পারলে মানুষকে আজোও থাকতে হতো পাহাড়ের গুহায় কিংবা গাছের কোটরে। গুহা থেকে সুরম্য অট্টালিকায় উত্তরণের পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তার পেছনে রয়েছে হাজারো বলিদান ও আত্মোৎসর্গ। স্বাধীন বুদ্ধি প্রয়োগে মানুষই মানুষের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এবং আজো আছে। মানুষ চালিত হয় সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা দ্বারা নয়তো বা অনিয়ন্ত্রিত চিন্তা দ্বারা। সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তার ফল কল্যাণ; অনিয়ন্ত্রিত চিন্তার ফল অকল্যাণ। চরম ও পরম সত্য এই যে, অন্ধকারকে আমন্ত্রণ জানাতে মানুষের কোনো চেষ্টার বা আয়োজনের প্রয়োজন হয় না কিন্তু আলোর জন্য থাকতে হয়ে বৌদ্ধিক প্রচেষ্টা ও মজবুত সংরক্ষণ উপকরণ।

আমরা বাস করি মিথ্যের মোহময় কলারাজ্যে। হাজার বছরের সংস্কারবদ্ধ উত্তরাধিকারী পৈতৃক মন সহজে কল্পনার আকাশচারিতা পরিহারে ব্যর্থ। কল্পনার ভাবরাজ্য থেকে বাস্তবের পৃথিবীতে অবরোহণে প্রধান অন্তরায় আমাদের পিতৃপুরুষের তৈরি অন্ধকার লৌহ নিগড়, মায়াময় শিকল, যা আজকের বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের যুগেও প্যারাডাইম শিফটের শক্তিশালী অবস্থানে অবস্থিত।

আমাদের মধ্যে ভন্ডালিজম খুবই প্রকট। আমরা বেঁচে আছি বিজ্ঞানের কল্যাণে কিন্তু মনে করি এবং প্রতিনিয়ত ভাবি যে, আমাদের জীবন ঐশী শক্তির উপর নির্ভরশীল। বাস করি বিজ্ঞানের যুগে এবং অবলম্বন বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক উপকরণ। বিশ্বাস বাঁধা থাকে কোন অশরীরী আত্মার ওপর। অথচ বিজ্ঞান সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে আত্মা বলতে কিছু নেই; অতিপ্রাকৃত শক্তি বলতে কিছু নেই; তা শুধু অজ্ঞান মনের ভ্রম-বিলাস মাত্র। অদৃশ্য কোনো কল্পরাজ্যের রাজপুরুষের নির্দেশে ধুলোমাটির মানুষকে চলতে হবে তা নির্মম পরিহাস ও উলঙ্গ উপহাস ছাড়া অন্য কিছু নয়। ব্যক্তির চালিকা শক্তি হতে হবে বৌদ্ধিক জ্ঞান ও বিবেকের নির্দেশ। লক্ষ্য যদি থাকে সামনে চলা তবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে হবে বাস্তবের কোন আলোকবিন্দুতে; অতীতের কোনো মরুভূমিতে বা বৃক্ষতলের কোন কঠিন ও নিরেট পাথরে নয়। মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে আপন শ্রেষ্ঠত্বের মাহাত্য। ঘটাতে হবে আপন শক্তির জয়যাত্রা। অস্থির চিরসঞ্চল ব্রহ্মান্ড গতিময় পৃথিবী, গতিশীল গ্রহ-তারা-নক্ষত্র। গতিশীল ও পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মননকে অতীত কেন্দ্রীয় বিন্দুতে স্থির রাখা মূর্খতার শামিল।

মানুষকে তার নিজের অযুত-সম্ভাবনাময় শক্তির উপর আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে যে, সে নিজেই নিজের ভালোমন্দ পাপপূণ্যের নির্ধারক। মানুষকে অনুধাবন করতে হবে সে দায়িত্ব তার একান্তরূপে নিজের। কৃতকর্মের ভার তার নিজেকেই বহন করতে হবে। মানুষকে নির্ভর করতে হবে তার আপন সত্তার ওপর। নির্ভর করতে হবে নিজের বুদ্ধির ওপর; বিবেকাশ্রিত যুক্তির ওপর। এ করেই মানুষকে অর্জন করতে হবে পূর্ণ মনুষ্যত্ব।

ছোটগল্প

রাশার খণ্ডিত পৃথিবী

মাহ্‌মুদ আলী

শ্রাবণ। বিকাল। আকাশ। রঙিন মেঘ।

এসব কিছুর মিলন মোহনায় কিশোরী রাশা একদিন তন্ময় হয়ে আকাশ দেখল, এ আকাশ কখনও তার চোখে পড়েনি। এ কেমন করে হল? একই সময় দক্ষিণ আকাশ লাল, হলুদ, নিলাভ, সবুজ, কমলা। আমার চোখ কি ফালি ফালি হয়ে গেল? এক চোখ থেকে এতগুলো রঙ বের হয়ে মেঘে মেঘে ছড়িয়ে পড়ল?

রাশা বসে পড়ে। শ্রাবণের ঘাসে। একেবারে জানু গেড়ে। ঘাসের গন্ধ আকাশের বিচিত্র রঙ তাকে মিশিয়ে দেয় প্রকৃতির রাজ্যে।

চেয়ে থাকে দক্ষিণ আকাশে। আকাশ রঙ বদলায়। রাশারও মনের রঙ বদলে যায়। সুকান্তের কবিতা পড়ছিল। ছাড়পত্র। কবিতার শব্দগুলি যেমন বদলে দিচ্ছে কবিতার প্লট, তেমন বদলে যাচ্ছে রাশার ভাবনা। কবিতার মাঝপথে একবার উচ্চস্বরে বলে যায়–

'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি–
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গিকার।'

এ কয়েকটি শব্দ মিলে যে বিষয়টি তৈরী হয়েছে, তা রাশার মনের ভিতরে হুড়মুড় করে ভেঙে ছুটে উল্কার মত জ্বলে ওঠে এবং মুহূর্তে শরীর থেকে ভীষণ বেগে বের হয়ে যায় দূরে অবস্থিত বস্তির দিকে।

সুকান্ত অঙ্গিকার করেছেন? না আমি অঙ্গিকার করব না, প্রতিজ্ঞা করব। অঙ্গিকার আর প্রতিজ্ঞার মধ্যে অনেক ফারাক।

রাতে রাশার ঘুম আসে না–এ বাড়িতে এমনিতেই ঘুম নেই, কারণ মানুষ নেই। ঘুমও সম্ভবত এখানে বাস করে না। তাই রাশা মাঝে মাঝে ঘুমহীন বাস করে। এ বাড়ি লোকালয়ে নয়, খুব নির্জনে, লোকে বলে পাঠান বাড়ি। পাঠান বাড়ি কবে কিভাবে নাম পড়েছে তার ইতিহাস কেউ জানে না। কেউ বলে মোঘল রাজত্বে এখানে এক প্রতাপশালী পাঠান বীর বাস করত, তাবৎ অঞ্চল এ বীরের দখলে ছিল। খুব অত্যাচারী ছিল এ বীর–মানুষকে খুব অত্যাচার করত, পাঠানের নাম শুনলে এক সময় মানুষের শরীরে লোম খাড়া হয়ে যেত। এ কু-কীর্তির জন্য মানুষ নাম রেখেছে পাঠান বাড়ি। এখন পাঠান-মাঠান কেউ নেই, শুধু বাড়ির সদর গেইটে একটা পাথরের ফলকে ফারসি অক্ষরে লেখা পাঠান বাড়ি, এ বাড়ির ইতিহাস বহন করে।

দশ বছর তার বাস এ পোড়া বাড়িতে–

কলকাতা আর্ট কলেজের মেধাবী ছাত্রী রাশা। অবিরাম ছবি আঁকে, স্কুল কলেজে গিয়ে বিনা পয়সায় ছাত্রদের মাঝে বিলিয়ে আসে। ছাত্ররা এ ছবি কেউ বুঝে কেউ বুঝে না। কেউ ছিড়ে ফেলে কেউ বইয়ের ভেতর ভাঁজ করে রাখে।

রাশা বর্তমান ভাবে না–ভবিষ্যৎও না। এ ভাবার বিষয় নয়, এ না-ভাবার বিষয়। অতীত রাশা খোঁচা দেয়, তবে পেছনের দিকে নয়–সামনে। একেবারে বুকে। রাশা কড়া কড়া কথা পথজনদের মাঝে উত্থাপন করে যায়, কিন্তু কেউ প্রশ্ন করে না। মানুষের কাছে প্রশ্ন অপেক্ষা বাঁচার তাগিদ ঢের বেশি। রাশা তো অর্ধ পাগল, মানুষ তাতো মেনেই নিয়েছে, অর্ধ পাগলকে প্রশ্ন কিসের? নগদ জীবনে বিশ্বাস নেই রাশার। সে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় নিজের কাছে, মানুষের জীবন এরকম কেন? ব্যবধান আকাশ-পাতাল। মানুষ না জন্মালেও তো পারতো? কি ক্ষতি হত? কার ক্ষতি হত? বন্যার স্রোতের মত মানুষের আগমন! এত মানুষ নিয়ে পৃথিবী মহাশূণ্যে ঘুরে বেড়ায়, পৃথিবী কি এটা বুঝে? কতদিন বহন করবে এটাও কি বুঝে?

রাশাদের পোড়া বাড়ির ছাদেও তার মত বেওয়ারিশ অনেক গাছ জন্মেছে, গাছের ফাঁকে চৌকুনো একটুকরো ঘাসেল জায়গা, রাশার বসার যোগান দেয়। এখানে সূর্যোদয়ে বসে-সূর্যাস্তেও বসে। জোছনায় বসে অমাবস্যায় বসে। এক জোছনায় রাশা জন স্টেইনবেকের The moon is down পড়ার আলো পাচ্ছে এক মোমবাতি থেকে। বইয়ে সে ডুবে

আছে, কিন্তু-চাঁদও ডুবে গেছে–খেয়াল নেই। মোমবাতি পুড়ে নিভে যাওয়ায় রাশা আকাশ দেখে–কিন্তু আকাশে চাঁদ নেই। একবার চারদিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল–সত্যিই তো চাঁদ ডুবে গেছে! শুয়ে পড়ছিল, তেমনি শুয়ে যেখানে চাঁদ ডুবে গেছে দৃষ্টি তার সেখানে অপলক চেয়ে রইল। কতক্ষণ চাইল বুঝতে পারে না, সে হিসেবও তার দরকার নেই। যেন মনে হচ্ছে চাঁদের কতগুলি আলো বাকি আছে সে হিসেব বাহির করা তার দায়িত্ব। রাশা সে হিসেবের মধ্যে না গিয়ে তার জীবনের অতীতে পাড়ি জমাল।

তখন তার বয়স চার হবে-
মায়ের বুকের উপর তার বাসা।
মা একা বাস করে-
মানুষের সাথে মিলমিশ কম।
কথা বলে আরও কম।
স্বরে-অ, স্বরে-আ পড়ে এক সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়ে রাশা।
হঠাৎ পুরুষালি কণ্ঠের চেঁচামেচিতে জাগে রাশা।
আমি বাচ্চার ভার নেব না? তোমাকে বলি নাই তুমি এব্যরশন কর?
আমি তো এব্যরশনের জন্য তো বাচ্চা পেটে নেইনি?
নেওনি তো তুমি এখন বহন কর, আমি ভার নেবনা।
কিন্তু বাচ্চা তো তোমার!
বিয়ের আগে বাচ্চা প্রসব দিলে, বাচ্চা পুরুষের হয়না, হয় মায়ের।
আমাকে তুমি বিয়ে করবে না?
না এরকম শর্ত আমার ছিল না।
মিথ্যে বলছ!
ধুম ধুম করে শব্দ হয় মায়ের পিঠে।
লাথি পড়ে পর-পর, পাছায়।
ঘুষি পড়ে নাকে–

এক ফালি রক্ত ছিটঁকে পরে রাশার নীল জামার উপর। চোখ তুলে তার জন্মদাতার দিকে তাকায়। বুঝে না ও তার বাবা। শুধু কাঁদতে থাকে। হিংস্র মনে হয় তাকে। গো-গো শব্দ তুলে বলে, আর কোন দিন আমকে ডাকবে না। তারপর হন হনিয়ে চলে যায়।

মায়ের উপর কষ-কষ আঘাত
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মায়ের কান্না,
এক অদ্ভুত লোকের বকা-ঝকা

কেমন মনে হচ্ছে রাশার, মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। কেন কাঁদে বুঝে না। কি করবে তাও বুঝে না। মা কিছুক্ষণ অন্ধকারে ঘুরে আসে, বক বক করল অনেকক্ষণ, কি বললো বুঝা যায় না। রাশাকে বুকে চাপিয়ে ঘুমিয়ে পরে। রাশা ছোট হলেও ঘুম পায়নি সেদিন। মা অবিরাম কাঁদছে। তার বাবা এসে আরো দুই ফালি বকা দিয়ে যায়। বাপরে! কেমন সাহস! বলছিলামনা মাইয়া। বুঝলি না, আমার মান মর্যাদা পুড়ালে। এখন বুঝ পৃথিবী সাদা না কালো।

আরো বড় হয়ে দেখেছে বাবার জন্য মায়ের নিত্য অপেক্ষা-কিন্তু বাবাকে সহ্য করা কঠিন হতো রাশার। এ এক ভিন্ন ভালোবাসা মায়ের বুকে দেখেছে। বাবার ওপর রাশার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সূচনা তখন থেকে।

কড়া রোদ। কর্মস্থলে কাজ করছে আজ কম সময়। দশ ঘন্টা রুটিন ফেল করে দুপুরে বাড়ি ফিরছে। যেখানে কাজ করে আসলে এ কোন কর্মস্থল নয়, সে নাক উঁচিয়ে বলে এ আমার কর্মস্থল।

পাঠান বাড়ির তিন কিঃমিঃ দূরে উঁচু এক পর্বত। এর উপর বিশাল এক খণ্ড পাথর, এ পাথর হচ্ছে রাশার কর্মস্থল। যার দৈর্ঘ ×প্রস্থ (৪০২×৩৮৮) ফুট। এটাকে কেটে কেটে পৃথিবীর মানচিত্র তৈরি করছে। পাথর কেটে তৈরি করতে চায় তার স্বপ্নের পৃথিবীর মডেল। এখানে সে সারাদিন হাতুড়ি বাটালি দিয়ে পাথর পেটায়। কেটে বের করে নিজের পৃথিবী।

কড়া রোদে আজ বাড়ি ফিরছে। বাড়ির গেটে দেখে এক পাগলি। জটা চুল। শরীর উলঙ্গ। দুই বছর আগে এই যৌবনা পাগলিকে দেখা যেত বক-বক করে যাচ্ছে।

'আমি দুই দুনিয়ার বাসিন্দা'।
'আমি দুই দুনিয়ায় বাস করি'।

আজ তাকে অন্য রূপে দেখা যায়। পাঠান বাড়ির গেটে উলঙ্গ বসে, নিজের ছয় মাসের মেয়ে শিশু কোলে। রাশার

শরীর ঘর্মাক্ত, পেন্ট, টি-শার্ট পাথরের গুড়োয় ধূসর। চুল ধূসর। হাতে শাণিত বাটালি হাতুড়ে। পাগলির এ দৃশ্য দেখে চমকে থামে রাশা। পাগলির উপর রাশার অদ্ভুত ছায়া পরে। অদ্ভুত এক প্রসব দৃশ্য রাশাকে করে তন্ময়। পৃথিবীর সমস্ত শ্লীল-অশ্লীল দৃশ্যের শব কাফনে মুড়িয়ে কফিনে ভেসে বেড়ায় রাশার ভাবনায়।

কাছে এসে প্রশ্ন করে–এ শিশু তোমার?

কোন উত্তর আসে না।

শিশুটি মায়ের কোল চেঁপে ধরে। অনেকক্ষণ ধরে বায়না চেপে আছে দুধ খাবে। এক ফুটা দুধ জমা নেই মায়ের বুকে। রাশা একটি পঞ্চাশ টাকা বের করে দেয়। পাগলি ছুড়ে মারে মহা সড়কের উপর। এমনি ভাব, নোটে ক্ষিধে মিটে? বুকে দুধ জমে?

রাশা ফের ভাবল–দশ বছর হল ও পাগল কিন্তু এ কোন জানোয়ার ওর পেটে বাচ্চা দিল! এ শিশুটির এখন কি হবে? কে তার বাবা? কে বহন করবে তার জীবনের ভার? যে জন্মদাতা সে অবশ্য জামা কাপড় পরে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, ওকে উলঙ্গ করে পেটানো উচিত।

রাশা পাগলিকে ঘুমুতে দেয় তার পাশের রুমে। ঘুমের আগে জিজ্ঞেস, তোমার নাম কি?

পাগলি নাম বলে না। খিলখিল করে হাসির ফোঁয়ারা তুলে। যেন ও পাগল নয়। রাশা আর পাগলির রক্তাক্ত বেদনা যেন হাসির ফোঁয়ারায় ভেসে যায় লোকালয় ছেড়ে।

রাশা নাম দেয়–নিশিতা।

নিশিতার সন্তান বুকে ঘুমায়।

রাশা ছাদে তার নিশালয়ে বসে ভাবে, এমন কার বিবেক! এ পাগলির পেটে সন্তান জন্ম দিল। হে প্রকৃতি এ জানুয়ারের বিবেক তুমি টুকরো টুকরো করে দিতে পারলে না? হে আকাশ তুমি ওকে চাপা দিতে পারলে না! রাত্রি! অন্ধকার! ওর শ্বাস টিপে ধরতে পারলে না? মাটি! তোমার বিবেক ছিল না? বাতাস, বাতাস তুমি কেন বহ? এ যদি ঠেকাতে পারলে না? নদী, তুমি দরিদ্রের বাড়ি ভেঙে নিয়ে যেত পার, পারলে না ওর বুক ভেঙে নিতে?

এ শিশুর ওপর আমার জীবনের ছায়া পড়েছে হুবহু। এ লৌকিক না অলৌকিক।

কোথায় খুঁজবে তার বাবাকে?

এ শিশুর তো একটা নাম চাই?

নাম-বিন্তা।

এ বিন্তা বড় হলে সমাজ তাকে ঘিরে বসবে, যে জানোয়ার তাকে জন্ম দিয়েছে ওই তাকে বলে বেড়াবে জারজ সন্তান।

অপমানে লাল হতে হবে মানুষের ভীড়ে। ঢেকে রাখতে হবে নিজের অস্তিত্ব। সমাজ মানবে না তার মতামত। কেন এমন হয়? এরা পৃথিবীতে আসে নি? গর্ভ থেকে আসিনি আমরা? আমাদের শরীরে তো অন্য গ্রহের রক্ত নয়, অন্য উপাদানের মাংস নয়?

হাতুড়ি বাটালির ব্যাগ পিঠে চেপেই ট্রেন চড়ে রাশা। ট্রেন দিক-দিগন্ত কেটে কেটে চলছে। কতটুকু পথ পাড়ি দিল ট্রেন এ হিসেব পায় না রাশা। তার দেহ ট্রেনে যাচ্ছে, ভাবনা পরে আছে কর্মস্থলে, ঐ গোল পাথরটির কঠিন শরীরে। প্রাণহীন কঠিন বস্তুটি এখন রাশার নিত্য দিনের দোসর। ভাবনার মডেল। কথা বলে একা একা এর সাথে। পাথরটিও রাশার ভাবনা খুলে দেয়। পর্বতের একটি চূড়ায় অবস্থিত, একটু উঁচু হয়ে আছে ভূমি থেকে। উত্তর দক্ষিণ আড়া আড়ি দাড়িয়ে। ইতোমধ্যে পাথরটি এবড়ো থেবড়ো ছিল। রাশা পাথটি কেটে বিশাল একটা গ্লোবের আকারে নিয়ে এসেছে। দূর থেকে দেখলে মিনি পৃথিবীর মত দেখায়।

ট্রেন হেকে যাচ্ছে।

ঘুম পালানোর প্রহর। এ প্রহর কাটে না।

দ্বীপের মত দুজনের আসনে একা বসে আছে।

এক স্টেশনে এক যাত্রী রাশার সহযাত্রী হল।

সহ যাত্রীর চেহারা পন্ডিত-পন্ডিত। দু-একটা পাকা চুল আলোয় ঝিলিক পাচ্ছে। পুরো চশমা চোখে। বিপরীত লিঙ্গের একজনের পাশে বসে কোন সংকোচ হল বলে মনে হল না। রাশা চোখ চশমার উপর রেখে বলে– আপনার টিকিট কোন স্টেশন পর্যন্ত?

চশমার ভেতর থেকে-ঢাকা।

তুমি ঢাকা যাচ্ছ?

না ঢাকা নয়, প্রথমে আখাউরা তারপর অন্যখানে।

কোন শব্দ হয় না অপ্রান্ত থেকে।

ঢাকা কি করেন?

আমি একটি কলেজে পড়াই–

অধ্যাপক কৌতুহলী হয়ে বললেন–তোমার নাম?

আমি রাশা।

কি কর?

ছবি আঁকি স্যার। এখন একটা বড় কাজে হাত দিয়েছি।

কি বড় কাজ!

আমার নিজস্ব পৃথিবীর মডেল। পাথর কেটে একটি গ্লোব তৈরি করছি, তারপর আমি কি রকম পৃথিবী চাই তার চিত্র পাথর কেটে কেটে নমুনা তৈরি করব।

অধ্যাপক বললেন তুমি কেমন পৃথিবী চাও?

আমার পৃথিবীতে কোন দেশ থাকবে না। গোটা বিশ্বটা হবে একটি দেশ। থাকবে না রাজা, মহারাজা। মানুষের নিজের কোন সম্পদ থাকবে না, সব সম্পদ সব মানুষের। যার যার যোগ্যতায় সমান বেতনে সবাইকে চাকরি করবে–যোগ্যতা নির্ধারণ হবে যান্ত্রিক ব্যবস্থায়। কোন কাগজি মুদ্রা নয়, মুদ্রা হবে যান্ত্রিক। আধুনিক মোবাইলের মত। লেখ্য এবং কথ্য ভাষা হবে এক। নাগরিক সুবিধা সমান সব মানুষের। কোথাও কোন শহর থাকবে না, কোন গ্রাম থাকবে না, সারা পৃথিবী পুরো একটি গ্রাম। সারা পৃথিবী হবে একটি শহর। সব জাতিভেদ ত্যাগ করে আমাদের পরিচয় হবে আমরা সবাই মানুষ।

সব মারণাস্ত্র পুড়িয়ে ফেলা হবে।

মানুষ, মানুষ হত্যা করবে না–পৃথিবীটা ছাব্বিশটি অঞ্চলে ভাগ করা হবে। ইংরেজি অক্ষরে নাম করণ হবে প্রতিটি অঞ্চলের।

অধ্যাপক ভাবলেন, মেয়েটি কি মাতাল!

অধ্যাপকের মুখে হতাশা দেখে রাশা ম্লান হাসে। অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে?

রাশার নাকের ওপর দৃষ্টি রেখে অধ্যাপক বলেন–ভাবনার একটা সীমাবদ্ধতা আছে, তোমার ভাবনার গতিটা সীমাবদ্ধতার দেয়াল অতিক্রম করে গেছে না?

স্যার, পৃথিবীতে যতকিছু আবিস্কার হয়েছে আবিস্কারক প্রথমে এইভাবে সীমাবদ্ধতার দেয়াল ভাঙাকে খুব কঠিন ভেবেছেন। কিন্তু, তাই বলে কি আবিস্কার হয়নি টেলিফোন, টেলিভিশন, কম্পিউটার?

স্যার আমি আজ ভাবলাম। বিজ্ঞান হয়ত একদিন এ সূত্র আবিস্কার করে ফেলতে পারে, অথবা ভিন গ্রহ থেকে উন্নত মস্তিস্কের একদল প্রাণী এসে পৃথিবীকে এভাবে আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে।

আখাউরা নামার সাইরেণ বাজতে থাকে–

স্যার আমার নামার সময় হল–

অধ্যাপক ঘাড় কিছু কাত করে বললেন–'ঠিক আছে'।

রাশা প্লাট ফর্মে নেমে অগ্রণি ধানি মাঠ ধরে পশ্চিম দিকে চলে, প্রকৃতি তার দিনের ডানা গুটিয়ে রাতের কয়েকটা পালক মেলে দিয়েছে মাত্র, চাঁদের ওপর থেকে বাধার আবরণ সরে পরায় জোছনা গলিয়ে মাঠে। মেয়েলি বাতাস জোছনার সাথে মাঠে সাঁতার কাটছে। রাশার শরীরে ফুর ফুর লাগে।

রাশার মা মাঠের ওপারে শ্যামপুর গ্রামে বাস করে। এ গ্রাম রাশার জন্মস্থান। মায়ের কাছে থাকেন তিনি। একটা জারজ সন্তানের জননী হওয়ার অপরাধ কুঁড়ে ঘরের সীমানায় অনুভব করছে খণ্ডিত জীবনে। মানুষের তিরস্কারের তীর ফালি ফালি করে মায়ের জীবন। দ্বীখণ্ডিত হয়ে পরে থাকে কুঁড়ে ঘরের মসৃণ মেঝে। দ্বীখণ্ডিত শরীর থেকে রক্ত বহে না, বহে প্রতিবাদ।

আমার এ সন্তান আমার শরীরের অংশ–

তার বাবার শরীরের অংশ,

তার সোনালী দেহে আমার ভাবনা।

এ প্রতিবাদের শক্তি সমগ্র ঘরকে উড়িয়ে নেয় মহাশূন্যে, ঘুরে বেড়ায় ছায়া পথে, পৃথিবীর শিরায় শিরায় এ চিৎকার ধ্বনিত হয়, কিন্তু কারো কানে পৌঁছায় না। যদি বা কেউ এ চিৎকার শুনে তবে থু থু ছুড়ে আমার ওপর।

মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে এক ঝলক।

মা সুমন্তা কাঁদে না-

রাশার জন্মাবধি থেকে বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় ভেসে আছে তার এ কঠিন জীবন। কত কেঁদেছে তার হিসেবের এখন ধার ধারে না সুমন্তা। তিরস্কারে কেঁদেছে, রাশার বাবার আচরণে কেঁদেছে, রাশার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভেবে কেঁদেছে। রাশা কলিকাতা আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে এসে ভেবেছিল মায়ের কাছে থাকবে, মা কে সুখি করবে। কিন্তু সমাজের তিরস্কার গঞ্জনার পরিমাণ এতই বেড়ে যায় শ্যামপুরে রাশা আর থাকতে পারেনি। পালাতে হয়েছে জন্মস্থান থেকে ত্যাগ করতে হয়েছে প্রিয় মাকে।

এক বিছানায় আজ ঘুমিয়ে মাকে বলে, মা আমি চব্বিশ বছরের রাশা। এতগুলি বছর আমার জীবন থেকে কেটে গেল, তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি কম হলে কয়েকশ বার। আমার বাবা কে? এখন কোথায় থাকেন? কিন্তু মুখ খোলনি। আজ

বলতে হবে কে আমার বাবা-আর কোথায় থাকেন?

মার চোখ কিছুটা মিহি হয়ে আসে-

মুখের চিত্রটার রঙ বদলে যায় ।

কড়া ভাষায় বলেন, 'তোমার কোন বাবা নাই' ।

মায়ের এ তিক্ত বাক্য রাশাকে অবশ করে দেয় । মায়ের বুকে হাত রেখে গুম হয়ে থাকে ।

মাঠের রূপালি জোছনার গন্ধ, অধ্যাপকের পুরো চশমা, ট্রেনের গঠর গঠর সব যেন একসাথে এসে রাশাকে নির্বোধ করে দেয় ।

মাকে বলে, তুমি বুঝ মা, বাবাহীন জন্ম নেওয়ার সামাজিক যন্ত্রণা?

তুমি বুঝো মা, সমাজে আমার কোন শেঁকড় নাই?

সমাজ আমার কোন মত গ্রাহ্য করে না-

মানুষের তিক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ হয় আমার শরীরে ।

সমাজ বলে আমার পায়ের তলার মাটি অপবিত্র!

আমার হাসি ভেঙে দেয় পৃথিবীর শান্ত অট্টালিকা ।

এতগুলি পাপের সৃষ্টিকর্তা যে বাবা, তাকে আমি দেখব না? অস্তিত্বটা অনুভব করব না? আমি কি জোর করে তোমার পেট দখল করেছিলাম?

সুমন্তার শরীর রাগে গিজ গিজ করে ।

রাশাকে থামিয়ে দেন ।

রাশা, আগুন পেটে রেখেছিলাম আমি । আগুন বের করে নিস্তার পাইনি, এর দাহে আমার জীবন পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছে । একটি জারজ সন্তানের জন্মদানের যন্ত্রণা তুমি বুঝো রাশা? সমাজ তো দুরে থাক, দুর্বা ঘাসও আমাকে ঠাঁই দেয়নি । সমালোচনার তিক্ত কালো চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত হচ্ছে মাতৃত্বের সোনালী শরীর ।

রাশা কাঁদে ।

সুমন্তা কাঁদেন না ।

মা ঝগড়া করতে আসি নি । যন্ত্রণা যেমন তোমার তেমন আমারও ।

প্রবন্ধ

অস্থির সময় স্বপ্নহীন ভবিষ্যৎ

অ.আ.ম. রেজা

'অসুস্থ তুমি, অসুস্থ শহর, অসুস্থ দেশ/দেশের পাজরে পূঁজা শহরের বুকে জমে আছে বেদনা বরফ–'

অস্থির সময়ের মধ্যে বাস করছি আমরা। চারদিকে কেবল অস্থিরতা, ভাঙন, অসুস্থ প্রতিযোগিতা। সব কিছু ভেঙে পড়ছে ক্ষয় ধরেছে সমাজে, মনুষ্যত্বে। এক দুর্বিসহ সময়ের মুখোমুখি আমরা। সময়টা খুবই অস্বস্থিকর, সংকটের, মনে গভীর আশংকা। দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া মোটেও ভাল নয়। বড় অসহায় আমরা। নেতাদের আলোচনা চলছে, চলবে কিন্তু কেউই দেশের কথা ভাবেনা, ভাববেন না। এই অবস্থায় আমাদের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

চারদিকে ঘটে যাওয়া ঘটনা, মানুষের হাহাকার, সামাজিক অস্তিরতা, নাগরিক জটিলতা, গ্রামীণ জীবনের সমস্যা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার সাথে যোগ হয় ব্যক্তিগত অস্থিরতা, সামাজিক বিবর্তন, ধর্মীয় গোঁড়ামি। এসব আমাদেরকে ভাবায়। ভাবনাগুলো নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আমরা যখন কিছু একটা করার চেষ্টা করি তখন নিষ্ঠুর সমাজ আমাদের দিকে হা করে থাকিয়ে থাকে এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ছে কিন্তু ঠিক মতো পরীক্ষা হয় না, পড়ানো হয় না। তরুণ, তরুণীরা পাস করে বেরোয় কিন্তু চাকুরী পায় না। যার জন্য হতাশায় ভোগে। এ অবস্থায় অশুভরা অশুভ আচরণ করছে প্রতিনিয়ত। যারা নষ্ট, যারা খুব খারাপ তারা আজ সমাজে শক্তিশালী এই সমাজে ভালো মানুষের স্থান নেই। খারাপরা দখল করে আছে ভালো মানুষের স্থান। সময় বদলেছে, পটভূমি বদলেছে অথচ মনোভাব বদলায়নি।

নারীদের সামাজিক মর্যাদা আজো অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। সীতা যে তিমিরে ছিলেন, তার কন্যারাও সে তিমিরেই রয়ে গেছেন। সম্প্রতি যুক্তরাজ্য প্রবাসী একজন লেখিকা সমাজে নারীদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন–'নারী হচ্ছে পুরুষের মাল্টি প্রোডাক্টস, ড্রয়িং রুমের শো পিস'। এটা এসেছে মেধাহীন, বুদ্ধিহীনদের মগজ থেকে। অনেকে এ উক্তিটির বিরোধিতা করলেও উক্তিটি সম্পূর্ণ সত্য।

আমাদের চোখ, কান, জিহ্বায় মরচে ধরেছে। আমরা কুঁজো হয়ে যাচ্ছি। অচল, অক্ষম, অনাথ হয়ে পড়ছি দিন দিন। আজো আমরা মুক্ত চিন্তা করতে পারি না। নিঃশ্বাস নিতে পারি না মুক্ত হাওয়ায়। দেশ ছেয়ে যাচ্ছে সাম্প্রদায়িকতায়, নিষ্ঠুরতায়, অত্যাচারে, অবিচারে। সুপরিকল্পিতভাবে প্রগতিশীলদের জব্দ করা হচ্ছে। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কথা বলবার অধিকার।

সমাজপতিরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। ধর্মের নামে, কর্মের নামে, শিক্ষার নামে, মনুষ্যত্ত্বের নামে। সমাজের সব জায়গায় ভুলের ক্রমবিকাশ। মানুষ এগুতে চায় সামনে, সত্যানুসন্ধানী মানুষ আলোর পথে পৌঁছতে চায়, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় কিন্তু তাঁদেরকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে দেওয়া হয় না। সুন্দর ও কল্যাণের প্রস্তুতির জন্য যাঁদের আন্দোলন, সমাজ থেকে পশু তাড়ানোর সংগ্রামে যাঁরা সদা প্রস্তুত। যাঁদের চোখে মুখে মানবতার অবিনশ্বর দৃপ্তি তাঁদেরকে এ সমাজ মেনে নেয় না। সত্য বলার অপরাধে সমাজ তাদের মেরে ফেলে।

লেখকের কলম তরবারির চেয়েও সহস্রগুণ ধারালো। কলমের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, সবচেয়ে নিপুন, সবচেয়ে ধারালো অস্ত্রও ব্যর্থ হয়ে যায়। একাত্তরের পর মনে করা হয়েছিল শত্রু পরাজিত হয়েছে; কিন্তু না। তারা আজো বাংলার উর্বর পলিমাটিতে নিঃশব্দে বুক টেনে হাঁটছে। রাষ্ট্র থেকে ওরা নির্বাসিত করছে মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিকৃত করছে ইতিহাস, সত্যকে ঢেকে দিয়েছে আবরণে। ধর্মের কথা বলে তারা অবস্থান নিয়েছে প্রগতির বিপক্ষে। কথা বলছে বাঙলার বিপক্ষে। তাদের কলঙ্কিত রক্ত ক্রমশই তাদের বর্বর হতে শিক্ষা দিচ্ছে। তারা চায় দেশ তাদের হাতে বন্দি থাকুক, দেশের বিবেকবান মানুষ হোক তাদের হাতের পুতুল। ওদের বিরুদ্ধে কলম ধরতে গিয়ে আজ প্রাণ দিতে হয়েছে প্রগতিশীলদের।

ইতিহাসের পাতায় আজ সত্য উপস্থিত নয়। ইতিহাস বিকৃত, মানুষ সন্ত্রস্ত, প্রাণ ওষ্ঠাগত, কণ্ঠ-রূদ্ধ। মানুষের ভিতর

আজ মানবিকতা অনুপস্থিত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দানবের হাঁক-ডাক, শিক্ষকের রক্ত ঝরে ছাত্র নামধারী কিছু অসভ্যদের হাতে। এ অবস্থায় কারো যেন দায় নেই, দায়বদ্ধতা নেই। প্রতিশ্রুতি নেই।

স্বাধীন দেশে আমাদের কি চাওয়া পাওয়ার ছিল। দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু থাকবে, ধনী দরিদ্রের বৈষম্য কমে আসবে। হত্যা, রাহাজানি, ধর্ষণ, সন্ত্রাস হবে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখতে পাই, ধনী গরিবের বৈষম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের আশি ভাগ সম্পদ ভোগ করছে দশ ভাগ লোক। দেশের সম্পদ পাচার হচ্ছে বিদেশে। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলছে। ইসলামি শাসন কায়েম করার জন্য অসংখ্য দল প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে অনৈসলামিক পন্থায়। ধর্মের নামে মানুষকে ধর্মান্ধ করা হচ্ছে। তারা বলছেন ধর্মে সব সমস্যার সমাধান আছে। কিন্তু নিজেরাই তা বিশ্বাস করেন না। ধর্মকে তারা ব্যবহার করছেন ফায়দা লুটার জন্য।

দেশ আজ দু'ভাগে বিভক্ত। এক দিকে প্রগতিশীল অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল। আলোর দিকে অগ্রসরমান প্রগতিশীলরা। তাঁরা যে সমাজের ছবি আঁকেন; সেখানে শিশুর হাসি, নারীর রূপ, ফুলের রূপ, রস, ঘ্রাণ, কবিতার মাধুর্য জীবনকে করে তাৎপর্যমন্ডিত। কিন্তু বিরোধীরা-এর সম্পূর্ণ বিপক্ষে। তাদের কাছে অন্ধকারটাই সত্য। তারা এদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। তারা নিজের রক্তকে বিশ্বাস করে না। তাই তারা নিজেদের বাঙালি পরিচয়ে আবদ্ধ করতে চায় না। প্রতিক্রিয়াশীলরা কোন দিনই বুদ্ধি প্রজ্ঞায় পেরে উঠেনি; এই পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে তাই দেখা গেছে। তারা আশ্রয় নিয়েছে বুদ্ধির বিরুদ্ধে শক্তির। তারা শক্তি দিয়েই বার বার রুদ্ধ করতে চেয়েছে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে।

রাষ্ট্র ও সমাজের শাসক যারা তাদের জন্য অন্ধকার খুবই প্রয়োজনীয়। দৃষ্টিহীনতা সৃষ্টি করতে তারা তৎপর। দৃষ্টিহীনতা কম হলে মানুষের মনে বিশ্বাসের জন্ম হয়। তখন মানুষ সাম্প্রদায়িক হয়। শিশুর মতো বিশ্বাস করে সবকিছু। কারণ সে তখন তার চিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেলে।। সমাজপতিরা আলো চায়নি, চায়নি আলোকিত মানুষ। তারা চায়নি দর্শন স্বতন্ত্র হোক ধর্ম থেকে, বিজ্ঞান বিকশিত হোক স্বাধীনভাবে। তারা চেয়েছে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য আর মানুষের হতাশা।

এই অবস্থা থেকে যারা নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছেন তারা হয়েছেন আলোকিত। অন্ধকারকে বলতে পেরেছেন অন্ধকার থেকে টেনে তুলবার চেষ্টা করেছেন অন্ধকারে নিমজ্জিতদের। আবার আঘাতও করেছেন সংস্কারের বিভিন্ন দুর্গে।

দেশের আজ যে অবস্থা তা আরো মারাত্মক হতো যদি সৃষ্টিশীলরা স্বোচ্ছার না হতেন। আমাদের চারদিকে যখন বিষের বলয় তখন প্রগতিশীল লেখক কবি সাহিত্যিকরাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন যে হচ্ছেনা তা নয়। এই মুক্ত চিন্তার আন্দোলন আরো বেগবান হওয়া চাই। এই আন্দোলনে আসতে পারে তরুণরা যারা এখনো স্বার্থ চিনে নি। এখনো যারা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি।

দাজ্জালের কথা

জাহিদ রাসেল

হুমায়ুন আজাদের 'আমার অবিশ্বাস' বইটি পড়া শেষ করে যেই না কোলের ওপর রাখলাম তখনি দেখলাম আমার পাশে বসা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক পাশ ফিরে আমার কোল থেকে বইটি তুলে নিলেন। নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সাথে বইটির কয়েকপাতা উল্টিয়ে আমাকে ফেরত দিলেন। আমাকে নাম জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছি জানতে চাইলেন। তিনিও তাঁর নাম জানালেন। আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা। আরো জানালেন, তিনি নিউইয়র্কের মদীনা মসজিদের খতিব। তাঁর কাছে ধর্মীয় প্রসঙ্গে লেখা অনেকগুলো বই দেখতে পেলাম। যেহেতু আমার হাতের কাছে আর পড়বার মতো কোন বই নেই, তাই তাঁর বইগুলো থেকে 'কান দাজ্জালের আবির্ভাব' বইটি তুলে নিলাম। শিরোনামটাই, আমাকে বোধহয় বইটা হাতে তুলতে আকৃষ্ট করলো। বইতে লেখকের নাম দেখে নিশ্চিত হলাম আমার পাশে বসা ব্যক্তিটিই এই বইয়ের লেখক। তারপরও তাঁকে প্রশ্নও করলাম তিনি লেখেছেন কি-না? তিনি মাথা নেড়ে জানালেন তিনিই লেখেছেন। তিনি আরো জানালেন, এটি নাকি ইতিপূর্বে মাসিক 'পরওয়ানা' নামক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়ে খুব পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিল, তাই এটিকে বই আকারে বের করেছেন। হুদা সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারলাম– হযরত আদম সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব-পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে মারাত্মক ফিতনা আর নেই।'

আমি আমার সংশয়বাদী পরিচয় প্রকাশ না করে তার সাথে কথা চালিয়ে যেতে লাগলাম :

মু আ হুদা : আমি এই বইটি লেখেছি ঈসা (আঃ) এর পুনরাগমনের এবং ইমাম মেহদীর আত্মপ্রকাশের পরের সর্বশেষ দাজ্জালকে নিয়ে। এই দাজ্জালের আগমনের পূর্বে আরো ২৯ জন দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "ততোদিন কেয়ামত হবেনা যতোদিন না (কমপক্ষে) ত্রিশজন মিথ্যা নবুয়ত এর দাবিদার দাজ্জালের আবির্ভাব না হয়েছে"।

জাহিদ : ও, দাজ্জাল তাহলে একজন না। তা, সর্বশেষ এই দাজ্জালের আবির্ভাব কখন হবে?

মু আ হুদা : হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন,–"ততোদিন পর্যন্ত দাজ্জাল বের হবে না যতোদিন না মানুষ বেমালুম দাজ্জালকে ভুলে যাবে এবং মসজিদের ইমামগণ মিম্বরে দাঁড়িয়ে দাজ্জালের কথা বলা ছেড়ে দেবে।" দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হবে প্রাচ্যের খোরসান বা তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায়। মনে করা হয়, সিরিয়া এবং ইরাকের মধ্যবর্তী কোন জনপদ থেকে সে বের হবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরো বলেছেন–"ত্রিশ বছর যাবত দাজ্জালের মা-বাবার কোন সন্তান সন্তানাদি হবে না; ত্রিশ বছরের পর তাদের একটি কানা, অত্যধিক মন্দ স্বভাবের একটি ছেলে সন্তান হবে। তার দুই চোখ ঘুমাবে কিন্তু অন্তর ঘুমাবে না। তার পিতা লম্বা হীনকায়, গাঁইতির মতো দীর্ঘ নাসিকা বিশিষ্ট হবে। তার মা বিশালকায় উন্নত বক্ষ, লম্বা হাত বিশিষ্ট হবে। বিভিন্ন হাদিসে মুহাম্মদ দাজ্জালের দৈহিক পরিচয় দিয়েছেন এভাবে, সে একজন পুরুষ, এক চোখ ফোলা, এক চোখের উপর মোটা চামড়া থাকবে, দুই চোখের মাঝখানে কাফ, ফা, রা অর্থাৎ কাফির লিখা থাকবে, সে হবে নিঃসন্তান।

[আমার মনের মাঝে ভেসে উঠলো ৪/৫বৎসর আগে বিটিভিতে প্রচারিত সিন্দাবাদ সিরিয়ালে সেই সমুদ্রদস্যু "কেহেরমানের" মুখখানি। তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যও অনেকটা দাজ্জাললের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। বিভিন্ন গল্প উপন্যাসে ভিলেনের চরিত্রগুলোর প্রতি পাঠক-পাঠিকার মনে ঘৃনা ও ভীতি সঞ্চায়ের জন্য যেমন তাদের শারীরিক দিকটিকে কদর্য ও ভয়াবহ করে তোলা হয় দাজ্জালের শারীরিক কাঠামো বর্ণনা সেই একই রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।]

জাহিদ : দাজ্জাল সর্ম্পকে আর একটু বলুন, শুনি।

মু আ হুদা : দাজ্জালের বাহন সর্ম্পকে বলা যায় "তার বাহন হবে এমন একটি গাধা যার দুই কানের মধ্যে ব্যবধান হবে চল্লিশ হাত। সে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো দ্রুত গতিসম্পন্ন"।

[দাজ্জালের গাধার বর্ণনা শুনে আমি হা হয়ে গেলাম। যেই গাধার দু-কানের মধ্যে ব্যবধান (মাত্র) ৪০ হাত, সে ঘোড়া কথিত অন্য আসমান থেকে পড়বে নাকি ডারউইনের তত্ত্ব সত্য প্রমাণ করে এই সময়ের ছোট খাটো গাধাগুলো দানবীয় রূপ লাভ করবে, তা ভাবতে লাগলাম।]

মু আ হুদা : (হুদা সাহেব মনে হয় আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন তিনি বলতে লাগলেন) আরে এইটা নিয়ে এতো ভাবনার কিছু নাই। আসলে দাজ্জালের বাহনটি রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে হয়তো। এটা হতে পারে কোন

সে সময়ের কোন বিশেষ বাহন। তাছাড়া দাজ্জালের অনুসারী হবে ইহুদিরা, এদের তো আল্লাহপাক গাধা বলেছেন। আর যে গাধার ঘাড়ের প্রস্ত ৪০ হাত তার গতিতে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো হতেই পারে।

[আজ যখন মানুষ শব্দের বেগ পরাজিত করে আলোর বেগে ছুটে চলার বাহন তৈরি করতে প্রস্তুত তখন আজ থেকে আরো পরে কেয়ামতের আগে (মরা মানুষ জীবিত করার মতো ক্ষমতাধারী) দাজ্জাল কেন যে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো ধীরগতির বাহন নিয়ে চলবে, তাও ভাববার বিষয়। এক্ষেত্রে পাঠকদের মনে রাখা দরকার এই গাধা দ্বারা ৪০ দিনে তিনি পৃথিবীর সব স্থানে যাবেন। আসলে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে মরুভূমিতে প্রধান বাহন ছিল উট। তাই সেই সময় বায়তাড়িত মেঘের বেগে চলা বাহন অপেক্ষা দ্রুতগতির বাহন কল্পনা করা সম্ভব হয়নি।]

জাহিদ : তা, দাজ্জাল রাজত্বের স্থায়িত্ব কত দিন হবে।

মু আ হুদা : দাজ্জালের রাজত্বের স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে মুহাম্মদ বলেন–"যে দুনিয়ায় চল্লিশ দিন থাকবে। এই চল্লিশ দিনের একদিন হবে একবছরের সমান, একদিন একমাসের সমান, এক দিন এক সপ্তাহের সমান, অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের স্বাভাবিক দিনের সমান"।

[হুদা সাহেব তার বইয়ের ২৫ পৃষ্ঠা খুলে আমাকে দাজ্জালের রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কে পড়তে দিলেন। আমি দেখলাম, বইয়ে উল্লেখিত কোনো কোনো হাদিসে বলা হয়েছে, দাজ্জালের রাজত্বের মেয়াদ ৪০ দিন আবার কোথাও বলা হয়েছে ৪০ বছর। কিন্তু এই কথার গড়বড়কে রূপকে হিসেবে ধরে নিয়ে বিভিন্ন ইসলামি মুহাদ্দিসগণ নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। মুসলমানেরাও খুব ভালো ছেলে; ওরা প্রশ্ন করে না, যা পায় তাই খায়।]

জাহিদ : তা, দাজ্জাল আর কী কী করবে?

মু আ হুদা : ঈমানের সর্বোচ্চ পরীক্ষা হবে দাজ্জালের সময়। যেমন–দাজ্জাল এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করবে, তাকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে বলবে। তারপর তাকে আবার জীবিত করে তুলবে এবং তাকে প্রশ্নও করবে–"তোমার প্রভু কে"। লোকটি উত্তর দেবে আল্লাহ। সেই লোকটি হবে জান্নাতে রাসুলের উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। দাজ্জাল আসবে লাখো পাপ পঙ্কিলতায় পূর্ণ তাগুতি বিশ্বকে নাফরমানিতে পূর্ণ করতে। আর অন্যদিকে ইমাম মাহদী আসবেন আল্লাহর দুনিয়াকে এসকল নাফমানির প্রভাত থেকে মুক্তি দিয়ে দুনিয়াতে আল্লাহর শাসন কায়েম করতে। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বলা যায়–কানা দাজ্জালের শান্তির বিশ্ব কায়েম হয়ে গেছে। আমরা মুসলমানেরা যেমন ইমামমেহদী আত্মপ্রকাশ এবং ঈসা (আ.) এর পুনরাবির্ভাবের জন্যে অপেক্ষা করছি তেমনি কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ দাজ্জালের জন্যে অপেক্ষা করছে he is coming স্লোগান নিয়ে। দাজ্জাল আসার আগে তার রাজত্ব কায়েম হয়ে যাবে। বিশ্বের আনাচেকানাচে যেকোনো ভাবে তার বাহিনী পৌঁছে যাবে। আপনি যদি বাংলাদেশের দিকে তাকান তবে দেখবেন-বাংলাদেশে বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন পরিচয়ে, বিভিন্ন কায়দায়, বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাসী কতিপয় লোক অতিসম্প্রতি তাদের বিশেষ কাজ শুরু করে দিয়েছে। তাদের দেখে মানবতার পরম হিতৈষী বন্ধু মনে হয়। কিন্তু এরা দাজ্জালের রাজ্যের বিস্তারে সাহায্য ছাড়া কিছুই করছে না।

জাহিদ : আমি ঠিক বুঝলাম না আপনি কাদের কথা বলছেন?

মু আ হুদা : অনেকেই তো আছে, কেন এই যে নামে বেনামে এনজিও গড়ে উঠছে এরাইবা কম কিসের।

জাহিদ : কেন ওরা তো অনেক ভালো কাজ করছে, যেমন মানুষকে স্বনির্ভর, শিক্ষা বিস্তার, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীদের...

মু আ হুদা : নারী স্বাধীনতা? জাহিলিয়া যুগের লক্ষণই হলো, নারীরা ঘরের বাইরে বের হয়ে আসবে-ব্যভিচার শুরু হবে। এই এনজিও এগুলো বৃদ্ধি করছে।

জাহিদ : দাজ্জালের অনুসারি কারা হবে?

মু আ হুদা : দাজ্জালের অনুগামীরা মূলত ইহুদিদের থেকেই হবে। তারপর বেদুইন পল্লীবাসী এবং মহিলারা।

জাহিদ : আলাদাভাবে মহিলাদের কথা বলার কী দরকার?

মু আ হুদা : ভণ্ডপীর, ভণ্ডনবী আর ভণ্ডবাদের তাবেদারিতে মহিলারা হরহামেশাই পুরুষের চেয়ে পাকাপোক্ত। দাজ্জালের ডাকে তাই মহিলারা সবচেয়ে বেশি সাড়া দেবে। দাজ্জালের ডাকে সাড়া দেবে তাই তখন মানুষ তার স্ত্রী, মা, মেয়ে, বোন ও ফুফুকে দড়ির সাহায্যে বেঁধে রাখবে।

[নারীদের ব্যাপারে একটা নতুন তথ্য জানা গেল! অবশ্য ধর্ম নারীদের পর্দার নামে বোরকা বন্দি করে রাখে, সে ধর্ম নারীদের

ব্যাপারে এ ধারনা পোষণ করতেই পারে, তাতে অবাক হবার বেশি কিছু নেই ।]

জাহিদ : দাজ্জালের কাহিনীটা শুনি তাহলে ।

মু আ হুদা : দাজ্জালের অভ্যুত্থান সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে হবে । ইস্পাহানের ৭০ হাজার তলোয়ারধারী ইহুদি তার তাবেদার হবে । অনেক দেশ জয় করবে এবং ধর্ম ভ্রষ্টও লোক তার অন্তর্ভূক্ত হবে । সে মক্কা ও মদিনায় প্রবেশের চেষ্টা করলে আল্লাহর নিযুক্ত ফেরেস্তা তাকে বাধা দেবে । দাজ্জাল তখন সিরিয়ার অভিমুখে যাত্রা করবে । দামেস্কে তখন ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবেন । একদিন আছরের সময় হঠাৎ ঈসা দু-জন ফেরেস্তার কাঁধের উপর ভর করে আসমান হতে অবতীর্ণ হবেন । দামেস্কের জামে উমাওয়ী মসজিদের পূর্ব দিকের মিনারের উপর এসে দাঁড়াবেন । ইমাম মাহদী তার উপর যুদ্ধের সমস্ত ভার ন্যস্ত করতে চাইবেন । কিন্তু তিনি বলবেন, ভার তো সব আপনার উপর থাকবে, আমি শুধু দাজ্জালকে বধ করবার জন্য এসেছি । ঈসা একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে একটি বল্লম/বর্শা হাতে দাজ্জালের দিকে ধাবিত হবেন । অন্যান্য মুসলমান সৈন্যগণ দজ্জালের সৈন্যগণের উপর আক্রমণ করবে । ভীষণ যুদ্ধ হবে । ঐ সময় ঈসার নিঃশ্বাসের মধ্যে এমন এক তাছির হবে যে, যতদূর দৃষ্টি যাবে ততো দূর শ্বাস যাবে এবং যে কাফিরের গাঁয়ে শ্বাসের একটু বাতাস লাগবে সে হালকা হয়ে যাবে । দাজ্জাল ঈসাকে দেখে ভাগবে । ঈসা তাকে পিছু নেবেন । 'বাবে লোদ' নামক স্থানে গিয়ে দাজ্জালকে বধ করবেন এবং তার বর্শায় দাজ্জালের রক্ত দেখাবেন । তারপর ঈসা যত জায়গায় দাজ্জাল অশান্তি স্থাপন করেছে, সেই সব স্থানে গিয়ে জনগণকে শান্তি দান করবেন । আল্লাহ ইহুদিদের নির্মূল করবেন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু থাকবে না যার আড়ালে গিয়ে প্রাণে বাঁচবে । পাথর, গাছ, দেয়াল, চতুষ্পদ জানোয়ার সবাই মুসলমানদের ডেকে লুকিয়ে থাকা ইহুদিদের দেখিয়ে দিয়ে হত্যার কথা বলবে । শুধু গারক্বাদ বৃক্ষ কোন কথা বলবে না । কারণ এটা ইহুদিদের গাছ ।

জাহিদ : তাহলে গাছেরও আলাদা ধর্ম আছে!

মু আ হুদা : কী বলে নাই আবার । তুলসি গাছও তো একটা হিন্দু গাছ । আর সব গাছপালাও তো আল্লাহর ইবাদত করে ।

জাহিদ : যুদ্ধে তাহলে তলোয়ার, বর্শা ও ঘোড়া ব্যবহৃত হবে । আজকের দুনিয়ায় যুদ্ধে যেখানে পারমানবিক-রাসায়নিক আধুনিক অস্ত্র, বিমান-রাডার ব্যবহৃত হচ্ছে সেখানে কেয়ামতের পূর্বে যে যুদ্ধ হবে তাতে কেন মধ্যযুগ বা প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত তলোয়ার বর্শা ও ঘোড়া ব্যবহৃত হবে এটা হাস্যকর নয় কি? আসলে আমার মনে হয় প্রাচীনকালে যারা এই ধরনের গল্প ফাঁদেন বা অন্য কোনো প্রাচীন গল্প থেকে সংগ্রহ করেন, তারা ভাবতেও পারেননি, দেড় দু-হাজার বছর পর পৃথিবীটাকে মানুষ কতোটা এগিয়ে নেবে । অবশ্য তার শুন্য মস্তিষ্কের অধিকারী অনুসারীরা এসকল গাঁজাখুরি গল্পের ফাঁক-ফোঁকর ঢাকতে বিভিন্ন রূপক অর্থ খোঁজায় খুবই দক্ষ । আর এই যে আপনি বলেছেন কেয়ামতের বিভিন্ন আলামত দেখা যাচ্ছে, দাজ্জালের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এই সব আলামতের লক্ষণ আপনারা বহু শ বছর ধরে পেয়ে আসছেন আরো বহু শ বছর পাবেন । কিন্তু চোখের পর্দাটা সরালে দেখতে পাবেন মানুষ সেই প্রাচীন অন্ধার সভ্যতাটাকে আলোর পথে অনেকদূর টেনে নিয়ে এসেছে, টেনে নিয়ে যাবে হয়তো আরো বহু দুর । আর এই সভ্যতা এগিয়ে যাবার পথে প্রধান সমস্য আপনাদের কাল্পিক দাজ্জাল নয় । প্রধান বাধা আপনাদের অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার । এই সব গাঁজাখুরি গল্প অনেকটা রোগের মতো । এর সব গল্পে বিশ্বাস করে অনেকে নিজেকে মানবসমাজের উদ্ধারকারী হিসেবে নিজেকে ইমাম মাহদী ঘোষণা করবে, ঘৃণা জন্মাবে ইহুদি সহ অন্য ধর্মালম্বীদের প্রতি । গত বৎসর ও পাকিস্তানে এমনি এক স্বঘোষিত ইমাম মাহদী তার কিছু অনুসারী সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে । দাজ্জালের মতো কাল্পনিক শত্রু তৈরি করে আর এধরনের গাঁজা খুরি গল্পে বিশ্বাস করে কাজের কাজ যা হয়েছে তা হলো মানুষে মানুষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়েছে...

মু আ হুদা : বেয়াদপের মতো কথা বলবে না । খুব বেশি বুইজ্জা ফেলছো, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, যে ছেলে হুমায়ুন আজাদের মতো একটা নাস্তিকের বই পড়ে তার সাথে এসব জ্ঞানের কথা বলতে যাওয়া মানে সময় নষ্ট করা । আল্লাহপাক তোমার হেদায়েত করুন ।

উনি রেগে হন হন করে চলে গেলেন ।

[একটি কাল্পনিক আলাপচারিতা]

(এর পর ৩য় পর্ব পড়ুন)